দাম : ষোলো টাকা

দাস্যভাবের এক বিরলতম উদাহরণ বীর হনুমান — পৃঃ ২৬

স্বস্তিকা

এনআইএ-র ওপর হামলার অর্থ দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা — পৃঃ ১৩

৭৬ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা।। ২২ এপ্রিল, ২০২৪।। ৯ বৈশাখ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ৩১ সংখ্যা, ৯ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

২২ এপ্রিল - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

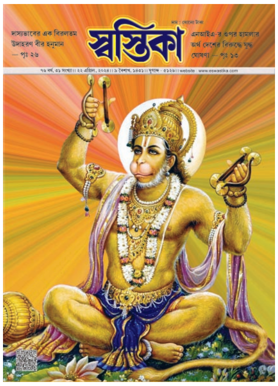

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

সব আসনে মমতা, কেবল প্রাণভোমরা অভিষেক ‘হরতি নিমেষাৎ কালসর্বং’ ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

বিশ্বগুরু হবে তো! ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

কট্টরপন্থী ধর্মীয় মনোবৃত্তি জেহাদি মানসিকতার প্রতিফলন ◻ ইমতিয়াজ মেহমুদ ◻ ৮

পাক-আফগান সীমান্তে খাইবার-পাখতুনওয়া প্রদেশে ফের হিন্দু মন্দির ধ্বংস প্রশাসনের মদতে ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

ভ্রষ্টাচারীদের ছাড়বে না আদালত ◻ অসিত চক্রবর্তী ◻ ১১

এনআইএ-র ওপর হামলার অর্থ দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৩

নির্বাচন কমিশন জেগে আছে তো? ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১৫

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা দুর্নীতির উৎস কোথায়? ◻ রানার চট্টরাজ ◻ ১৭

বাল্মীকির রামায়ণ লোককল্যাণে রচিত, হনুমানের রামায়ণ ভক্তিরসে জারিত ◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ২৩

দাস্যভাবের এক বিরলতম উদাহরণ বীর হনুমান ◻ গোপাল চক্রবর্তী ◻ ২৬

বীরত্বের দিব্যরূপই তাঁর স্বরূপ, সংকটমোচন হনুমানে তাই আস্থা শ্রীরামচন্দ্রের ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ৩১

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব তিথি রামনবমী ◻ প্রদীপ মারিক ◻ ৩৩

ভারতের লোকসভা নির্বাচন বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল নির্বাচন ◻ ধর্মানন্দ দেব ◻ ৩৫

ভারতে হনুমৎ শক্তির সার্বিক জাগরণ ◻ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ৩৬

মা-মাটি-মানুষের নেত্রীর স্বরূপ ◻ অমিত কুমার চৌধুরী ◻ ৩৮

মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম এবং ভারতবাসীর সংকল্প ◻ শ্রীমৎ স্বামী নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী ◻ ৪৪

এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কি আর ৪২ আসনেই প্রার্থী নন? ◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ রঙ্গম : ৪৩ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৫০

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে ২৯ এপ্রিল, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৯ এপ্রিল, ২০২৪

ভারতীয় সংস্কৃতিতে পতিতপাবনী মা গঙ্গা

ভারত সংস্কৃতির পুণ্যপ্রবাহ পতিতপাবনী মা গঙ্গা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির চিরন্তন পরিচিতি। শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বপুরুষরা বহু বছরের সাধনায় ভারতভূমিতে তাঁর অবতরণ ঘটিয়েছেন।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় মা গঙ্গার বিষয়ে বিভিন্ন দিকের আলোচনা করবেন নন্দলাল ভট্টাচার্য, চঞ্চল কুমার ঘোষ, দেবজিৎ সরকার, অভিমন্যু গুহ, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, হীরক কর প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জয় মহাবীর হনুমান

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট জানিতে চাহিলেন, নিরন্তর ভজন-ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া যে সকল অনন্যচিত্ত ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন এবং যাঁহারা কেবলমাত্র অবিনাশী সচ্চিদানন্দ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন — এই উভয় প্রকার উপাসকের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা? ইহার উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উনবিংশটি শ্লোকে প্রকৃত ভক্তের বৈশিষ্ট্য ও ভক্তির বর্ণনা করিয়াছেন। গীতাগ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে তাহা ভক্তিযোগ নামে আখ্যায়িত হইয়াছে। একইরূপে শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্রে নয় প্রকার ভক্তির উল্লেখ রহিয়াছে। সেই নয় প্রকার ভক্তি হইল— শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। শাস্ত্রে ইহাকে নবধা অথবা নববিধা ভক্তি বলা হইয়াছে। এই নবধা ভক্তির এক-একটিতে যাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হইলেন, শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিত, কীর্তনে কৃষ্ণসাধিকা মীরাবাঈ, স্মরণে ভক্ত প্রহ্লাদ, অর্চনে মহারাজ পৃথু, পাদসেবনে বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীদেবী, দাস্যভাবে মহাবীর হনুমান, সখ্যভাবে মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন এবং আত্মনিবেদনে দৈত্যরাজ বলি ।

মহাবীর হনুমান আদিকবি বাল্মীকির এক অপূর্ব সৃষ্টি। গোস্বামী তুলসীদাস হনুমান স্তোত্র রচনা ও স্তব করিয়াই বিধর্মী আকবর বাদশার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। শ্রীরামকার্যেই বীর হনুমানের জন্ম— রাম কাজ কীহেঁ বিনু, মোহি কহাঁ বিশ্রাম। শ্রীরামের আশীর্বাদেই তিনি চিরঞ্জীবী। জ্ঞান,শক্তি, সাহস, ভক্তি ও অনুশাসনের তিনি মূর্ত বিগ্রহ। শ্রীরামকার্য সাধনই তাঁহার জীবনব্রত। তাঁহার শ্বাসে-প্রশ্বাসে জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম তাঁহার রণহুংকার নহে, তাহা কর্মোদ্যমের প্রেরণাশক্তি। সবকিছুতেই তাঁহার জয় শ্রীরাম। সাগর উল্লম্ফনের সময়ও তাঁহার জয় শ্রীরাম; গন্ধমাদন উত্তোলন করিবার সময়ও জয় শ্রীরাম। অশুভ শক্তির হৃদয়ে ত্রাস সৃষ্টি করিবার জন্যও জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম তাঁহার শুভশক্তি সম্পাদন করিবার সংকল্প মন্ত্র; অধার্মিক ও দুষ্টদিগের প্রাণে হৃৎকম্প সৃষ্টি করিবার মহারব। হতাশা-নিরাশায় নিমজ্জিতদের মনে কর্মোদ্যম সৃষ্টি করিবার ইহা মহামন্ত্র। শ্রীরামভক্ত হনুমান ইহার উদ্গাতা। পরাধীন ভারতবাসীর হৃদয়ে কর্মোদ্যম ও সাহস সঞ্চার করাইবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বীর হনুমানকেই তাহাদের আদর্শ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, মহাবীর হনুমান শ্রীরামের কার্যে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। জীবন মরণে দৃকপাত নাই। মহা জিতেন্দ্রিয়, মহা বুদ্ধিমান। দাস্যভাবের এই মহা আদর্শে তোমাদিগকে জীবন গঠন করিতে হইবে। আর এইরূপ হইলেই অন্যান্য কার্যের স্ফূরণ আপনা-আপনিই হইয়া যাইবে। দ্বিধাশূন্য হইয়া গুরুর আজ্ঞা পালন আর ব্রহ্মচর্য রক্ষা—ইহাই হইতেছে সফল হইবার একমাত্র রহস্য। ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় পথ নাই। তিনি যুবকদিগকে স্মরণ করাইয়াছিলেন, ভক্ত হনুমানের একদিকে যেইরূপ সেবাভাব, অন্যদিকে তেমনই ত্রিলোকসন্ত্রাসী সিংহবিক্রম। শ্রীরামের কার্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা রাখেন না। শ্রীরাম ব্যতীত তাঁহার সকল বিষয়ে উপেক্ষা— ব্রহ্মত্বলাভে পর্যন্ত। শুধুমাত্র রঘুনাথের আদেশ পালনই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত। এইরূপ একাগ্রচিত্ত হওয়া চাই। ইহাতেও স্বামীজী ক্ষান্ত না হইয়া বলিয়াছিলেন, এখন দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীর হনুমানের পূজা চালাইয়া যাইতে হইবে।

স্বামীজীর সেই উজ্জীবন বার্তা বর্তমান ভারত পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছে। অযোধ্যায় রামলালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। দেশময় শ্রীরামের পূজা শুরু হইয়াছে। কোটি কোটি মানুষ পথে নামিয়া রামনবমী উদ্‌যাপন করিতেছে। রামমন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আইনি লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী হনুমৎ শক্তি জাগরণের অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছে। পক্ষকাল ব্যাপী ঘরে ঘরে হনুমান চালিসা পাঠ হইয়াছে। দেশময় মহাবীর হনুমানের পূজা হইয়াছে। কোটি কোটি দেশবাসীর বিশ্বাস যে, হনুমৎশক্তির জাগরণের কারণেই অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। চিরঞ্জীবী হনুমান। শুভকার্যে, শ্রীরামকার্যে তিনি সতত ভক্ত হৃদয়ে মহাবলের সঞ্চার করিয়া থাকেন। তাঁহার শক্তিতেই ভারতে নববলের সঞ্চার ঘটিয়াছে। তাঁহার জন্মতিথিতে তাঁহাকে শতকোটি প্রণাম। জয় সংকটমোচন মহাবীর হনুমান।

সুভাষিতম্

ন মুক্তাভির্ন মাণিক্যৈঃ ন বস্ত্রৈর্ন পরিচ্ছদৈঃ।
অলংকিয়েত শীলেন কেবলেন হি মানবাঃ।।
মণি, মুক্তা, সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদে নয়, কেবল চরিত্রবলেই মানুষ অলংকৃত হয়ে থাকে।

সব আসনে মমতা, কেবল প্রাণভোমরা অভিষেক

‘হরতি নিমেষাৎ কালসর্বং’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

ডায়মন্ডহারবারের মতো নিবিড় মুসলমান কেন্দ্রেও বিজেপি ২০১৯-এর ভোটে ৩৪ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছিল। উগ্রভাবে ধর্মনিরপেক্ষ (পড়ুন গোপনে মুসলমানবাদী) বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস পেয়েছিল যথাক্রমে ৭ আর ১.৫ শতাংশ ভোট। খানিকটা গায়ের জোরেই তৃণমূল কংগ্রেস ‘দুধেল গাই’-দের থেকে ৫৭ শতাংশ ভোট ছিনিয়ে নিয়েছিল। ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে এবার জলের মাপ বনাম প্রাণভোমরার লড়াই। একডুবে সে ভোমরা তুলতে চাইছে বিজেপি। ভোমরা যেন কোনোভাবেই ফসকে না যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও। তারই রথ নিত্যই উধাও, জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন, চক্রে-পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন।’

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যে আসলে অনতিক্রম্য ‘কাল’, তাই বোঝাতে চেয়েছিলেন বিশ্বকবি। দেবতারাও তাকে অতিক্রম করতে পারেন না। এ যুগের রাজনীতিকরা এর কতটা বোঝেন আমার সন্দেহ আছে। সময়কে আমি উপেক্ষা করি না। কেউ মূর্খ বা অবোধ হলে দায় আমার নয়। মহাভারতকার ব্যাসদেব আমাকে তাই শিখিয়েছেন। সময় বিচার করে তাই এটা বলা চলে সর্বোচ্চ ক্ষমতার বিরুদ্ধে যে লড়তে পারে কেবল তারই সেই ক্ষমতার প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অধিকার জন্মায়। ইতিহাসের বিচারে ব্যতিক্রম নিয়ম হয় না।

সারা দেশে ৪৪৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বিজেপি। তাদের দ্বাদশতম প্রার্থী তালিকাটি প্রকাশও করেছে। তাতে ৭টি নাম রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজন। অভিজিৎ দাস (ববি)। ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের স্থানীয় বিজেপি নেতা। বাকিগুলি পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র থেকে। প্রতিবেদন লেখা অবধি ১৯টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা বাকি।

তৃণমূলের ভোটারদের কাছে ডায়মন্ডহারবার প্রাণভোমরা। রাজ্যের ৪২টি কেন্দ্রে তৃণমূলের মাত্র দু’জন প্রার্থী। ৪১টি কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। ডায়মন্ডহারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার উত্তরাধিকারী। অবশ্য ততদিন যদি তৃণমূল কংগ্রেস বলে অবশিষ্ট কিছু থাকে। তৃণমূল নেত্রীর কাছে এটাই প্রাণভোমরা। ডায়মন্ডহারবারকে অটুট রেখে কাঁথি, তমলুক বা আরামবাগ চুলোয় গেলেও মমতার কিছু যায় আসে না। এটা কেন তা বোঝা দায়।

অনেক ভাবনাচিন্তা করে তবেই বিজেপি ডায়মন্ডবারহারবারে স্থানীয় নেতাকে নেতাকে প্রার্থী করেছে। রাজ্যের জন্য চতুর্থ তালিকায় সে নাম এসেছে। ডায়মন্ডহারবারে প্রার্থী কে হবেন তা নিয়ে উদ্‌গ্রীব ছিলেন বিজেপি নেতারা আর ভোটারা। কৌতূহলী ছিলেন রাজ্যের মানুষ। ফলে আজগুবি জল্পনা আর অপ্রাসঙ্গিক লোকেদের নাম ঘুরছিল।

সবচেয়ে দূরের দফায় রয়েছে ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্র। ভোট ১ জুন। এখানে মমতাকে প্রার্থী খুঁজতে হয়নি। অভিষেক বাহিনীর দারুণ হাতযশ। ২০১৯-এর ভোটে আনুমানিক দু’হাজার বুথের ভিতর মাত্র ৩৩৩টি বুথ থেকেই দুধেল গাইয়েরা অভিষেকবাবুর জন্য ৮৯ শতাংশ ভোট সংগ্রহ করে দিয়েছিল। বুথগুলির ২.৮ লক্ষ ভোটের মধ্যে ২.৫ লক্ষ ভোট পেয়েছিলেন অভিষেকবাবু। বাকি ১৬০০ বুথ থেকে তিনি পান সাড়ে ৫ লক্ষ ভোট। ১৯৮৪ সাল থেকে সাত বারের সাংসদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোদিন যা ভাবতে পারেননি, মাত্র ৩২ বছর বয়সে এত বড়ো রাজনৈতিক কারসাজি করতে পেরেছেন অভিষেক।

> **রাজ্যের ৪২টি কেন্দ্রে তৃণমূলের মাত্র দু’জন প্রার্থী। ৪১টি কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। ডায়মন্ডহারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতার উত্তরাধিকারী।**

তৃণমূল বহুধা অভিযুক্ত দল। সেখানে অভিষেকবাবুর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে না। দলে সবাই জেতে মমতার জোরে। অভিষেক জেতেন নিজের জোরে। তাই ‘কোহিনূর’ বাঁচাতে মমতা যে তাঁর সব অস্ত্র ব্যবহার করবেন সেটাই স্বাভাবিক। রাজ্যের সাড়ে সাত কোটি ভোটারের ২ শতাংশ (১৭ লক্ষের কিছু বেশি) রয়েছে এই কেন্দ্রে। তবু কেন এই কেন্দ্র পাখির চোখ। অনিয়ম আর বেনিয়মের দুটি আলাদা অর্থ। বিজেপি বসিরহাট, তমলুক ও কৃষ্ণনগর জিতলে ২০২৬-এর মমতা-বিরোধী দিশা তৈরি হবে। আর ডায়মন্ডহারবারে জিতলে শত্রু বিনাশ হবে।

রাজনৈতিক পাশাখেলা শত্রু বিনাশের মূল অস্ত্র। তাই ধীরে চলো নীতি নিয়ে শেষ ভাগে সকলকে চমকে ডায়মন্ডহারবারে স্থানীয় প্রার্থী দিল বিজেপি। এটাই ‘মাস্টার স্ট্রোক’। বিজেপি জানে ‘নবান্ন’ খুব দূরে নয়। নদীর সোঁতা দেখা যাচ্ছে। তারা এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চায়। ২০২৬-এর আগের ইঙ্গিত। বিজেপি এটাও জানে ‘হরতি নিমেষাৎ কালসর্বং’। কাল সব হরণ করে নেয়। আবার বলি বিজেপি এখানে জিততে এসেছে, হারতে নয়। □

সুন্দর মৌলিকের চিঠি

বিশ্বগুরু হতে হবে তো!

আঞ্চলিকেষু দিদি,

আপনি ও আপনার দল এবার নির্বাচনে দেখছি একটাই কথা বলে চলেছে— মোদীকে হঠাতে হবে। কিন্তু কেন হঠাতে হবে তার কোনও যুক্তি দেওয়া হচ্ছে না। এটা আমাকে খুবই অবাক করছে দিদি। আপনাদের বলার মতো কি কিছু নেই? আপনি রাজ্যের নানা প্রকল্পের কথা বলছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা বাড়ানোর কথা বলছেন। কিন্তু ভোটটা তো দিদি দেশের। রাজ্যের কথা বলে কী হবে? আগামী ভারত কেমন বানাতে চান সেটাই তো প্রচারে বলার কথা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কেন নরেন্দ্র মোদী সরকার এত ব্যবস্থা নিচ্ছে এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলার তো কথা নয়। আগামী ভারত মানে শুধু দেশের মানুষের জন্য কী কী করা হবে সেটাই নয়, বিশ্বের দরবারে ভারত কোথায় যাবে সেটাও তো বলতে হবে। বলতেই হবে। কারণ, আমরা বিশ্বগুরু ছিলাম একটা সময়ে। আবার আমার সেই হারানো সিংহাসন ফিরে পেতে চাই। বিশ্বের তৃতীয় অর্থনীতির দেশ হতে চাই। বিশ্বের সব দেশ আমাদের সমীহ করে চলবে এমনটাও দেখতে চাই।

এই ক্ষেত্রে গত দশ বছরে কোথায় কত দূর আসা গেল, নানা দিক থেকে সেই প্রশ্ন তোলা দরকার। প্রধানমন্ত্রী মোদীর দ্বিতীয় দফার প্রধানমন্ত্রিত্ব শেষে হিসাবের খাতা বলছে, একটি উজ্জ্বল বিষয় রয়েছে। বিদেশনীতি বিষয়টি যে ভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে গুরুতর হয়ে উঠেছে, অতীতে তা কখনও হয়নি। দশ বছরে ভূরাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা পালটেছেও বটে এবং সেই পরিবর্তন ভালোর দিকে, শক্তির দিকে। এটা সবাই বলছে। এই পরিবর্তনের গোড়ার কথাটিই হলো, দুই বিশ্বশক্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সঙ্গে পাশাপাশি সম্পর্ক বজায় রাখার কৃৎকৌশল। এই ব্যাপারে ভারতের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। আমেরিকার মহা-প্রতিপক্ষ চীন। সে ভারতের সঙ্গে মৈত্রী চাইছে। এবং আমেরিকা-শত্রু রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকার সঙ্গে মিত্রতার হাত বাড়িয়েছেন মোদী। এককালে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় আমেরিকা-রাশিয়া দ্বৈরথে ভারত একটি মধ্যবর্তী অবস্থান তৈরির চেষ্টা করেছিল, সেই নির্জোট আন্দোলনের সময়কালকে মনে করিয়ে দিতে পারে গত দশ বছরের এই কূটনৈতিক মধ্যগামিতা।

ভূরাজনীতির গতিপ্রকৃতি সব সময়েই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বায়িত অর্থব্যবস্থা, বাণিজ্য-সমীকরণ, সমরাস্ত্র-সমর্থন ইত্যাদি মিলিয়ে যে একটি বড়ো ব্যবস্থাবিধি চলমান, তার নিজস্ব একটি গতিরেখা আছে। ভারতীয় বিদেশনীতি সেই গতিরেখাটি ধরে সফল ভাবে চলতে পেরেছে এবং তার সুযোগসুবিধা নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পেরেছে, এটাই আসল কথা। উদাহরণ হিসেবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কথা বলা যেতে পারে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে পশ্চিম বলয়ের শত চাপ সত্ত্বেও ন্যাটোর মতে ভারত সর্বদা নিজমত মেলাতে রাজি হয়নি, যুদ্ধের জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জের সভায় আনীত প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেনি, কেননা ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয় ছিল তাতে। আমেরিকা যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হলেও ভারতীয় অবস্থান কেবল তাকে মানতেই হয়নি, তার সঙ্গে রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টির কাজে ভারতের ভূমিকাটিকে কাজেও লাগাতে হয়েছে। কূটনীতির এটিই দস্তুর, নিজের স্বার্থ দৃঢ়ভাবে মেনে নিজেকে অন্যের চোখে সম্মানস্থানে উন্নীত করা। সে কাজে ভারত বিশেষ সফল। জি-২০-র মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের সাফল্যও নজর-কাড়া, সন্দেহ নেই।

দেশের উন্নতি না হলে বিদেশ তার কথা শোনে না। তাই আরও পাঁচ বছর যদি দেশের শিরোভাগে নরেন্দ্র মোদী আসীন হন, তাহলে ভারত সমৃদ্ধ হবে বলেই মনে হয়।

'বিশ্বগুরু' ভূমিকার কথাও এই প্রসঙ্গে আসে। একবিংশ শতকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে একমাত্র মোদীই তাঁর ব্যক্তিগত ক্যারিশমা ও জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে ভারতকে বিশ্বগুরুত্বে অভিষিক্ত করতে পারেন তা মানতেই হবে। আসলে কূটনীতি চলে অনেক শক্ত মাটির উপর, ফাঁপা প্রচারের নরম মাটিতে তার রথ বসে গেঁথে অচল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। আর সেই কাজটাই করে দেখিয়েছেন মোদী। দেশের উন্নতি না হলে বিদেশ তার কথা শোনে না। তাই আরও পাঁচ বছর যদি দেশের শিরোভাগে নরেন্দ্র মোদী আসীন হন, তাহলে ভারত সমৃদ্ধ হবে বলেই মনে হয়। আর সেটা হলেই বিশ্বে ভারতের মর্যাদা আরও অনেক বেড়ে যাবে।

মোদী ক্ষমতায় থাকলে ২০৩৬ সালে ভারতের মাটিতে অলিম্পিক্স অনুষ্ঠিত হওয়ার দাবিটি কিন্তু হেলাফেলার নয়। দিদি, এখন আর সময় নেই। তবু বলছি, লোকসভা নির্বাচন মানে কী কী বলতে হয় সেটাই ভাবুন। আপনার আঞ্চলিক ভাবনা কিন্তু হালে পানি দেবে না। □

অতিথি কলম

ইমতিয়াজ মেহমুদ

কট্টরপন্থী ধর্মীয় মনোবৃত্তি জেহাদি মানসিকতার প্রতিফলন

ইসলাম সেই লোকগুলিকে নির্বাচন করে, তাদেরকে লালনপালন করে, টাকাপয়সা দিয়ে সবরকম তোল্লাই দেয় যারা বিধর্মী সমাজে এই 'মতভেদ' সৃষ্টি করে এবং সমাজের ভিতরে 'ফল্ট লাইন' বা চ্যুতিরেখা সৃষ্টি করে আড়াআড়িভাবে সামাজিক বিভাজন ঘটায়।

১৯৮৮ সালে সলমন রুশদির লেখা 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এই বইটির ওপর ইরানের শিয়া নেতা খোমেইনি ফতোয়া বা নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সলমন রুশদির ব্রিটিশ নাগরিকত্বের সৌজন্যে ব্রিটেন সরকার তাঁকে পুলিশি সুরক্ষা প্রদান করে এবং তাঁকে আত্মগোপন করতে বাধ্য করে। কট্টর মুসলমানরা ব্রিটেনে তাঁকে হত্যা করতেও পারত। একদল উন্মত্ত জনতার দ্বারা তাঁকে পিটিয়ে মেরে ফেলাও হয়তো সম্ভব ছিল। তাঁর এই প্রাণসংশয়ের বিষয়টি ইংরেজ সরকার ভালো ভাবেই জানত। ব্রিটিশদের কাছে এই তথ্য থাকার ফলে এটা মনে করা যেতে পারে যে এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত আসল সত্যের সন্ধান ব্রিটিশের পক্ষে অতি সহজ কাজ।

পশ্চিমি দুনিয়ার 'মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা'র অধিকার ও ধারণার সঙ্গে সহমত নয় মুসলমানরা। এমনকী তারা এই ধারণাকে সম্মানও করে না। এমন কোনো পদ্ধতিও নেই যার মাধ্যমে কোন ইসলামি দেশ ইসলাম নিন্দাকারীদের সম্ভাব্য হত্যাকারী তা নিশ্চিত হওয়া যায়। এর সুযোগে মুসলমানেরা উন্মত্ত জনতার ভিড়ের চরিত্র সহজেই পরিগ্রহ করতে পারে। এই কারণে ব্রিটেন নিজের দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা করতে চাইলে তাদের উচিত মুসলমানদের অবৈধ অনুপ্রবেশে লাগাম টানা। বাস্তবে প্রতিটি পশ্চিমি দেশেরই এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক। কিন্তু এই কাজ করার বদলে মুসলমানদের জন্য তারা তাদের দেশের দরজা পুরোপুরি খুলে দিয়েছে এবং বৈধ-অবৈধ সব রকমের অভিবাসনে তাদের উৎসাহিত করে চলেছে। ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এবং প্রাক্তন জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মর্কেলের উদাহরণ তো আছেই। তাহলেই ভাবুন যে পশ্চিমি দুনিয়া আজ এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কীভাবে পৌঁছলো?

ভ্রষ্টাচারী বামপন্থীদের অবদান: উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে রয়েছে সেই পর্বে যখন পশ্চিমের শিক্ষিত, উন্নত, সমৃদ্ধ ও সুখী দেশগুলির অভিজাতবর্গ যে দেশগুলি শাসন করছিল— লোকজন হাততালি দিয়ে তাদের শাসনের তারিফ করলেও তারা তাদের শাসিত সেই দেশগুলিকেই ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। ঊনবিংশ শতকে কার্ল মার্ক্সের জন্মের পর এই ব্যাপারগুলো শুরু হয়। মার্ক্সীয় তত্ত্ব সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং ধনী ও অভিজাতশ্রেণীকে সন্ত্রস্ত করে। পুঁজি ও পুঁজির প্রবাহের অপব্যাখ্যা তিনি হাজির করলেন এবং উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল জনগোষ্ঠীকে অভিজাত শ্রেণীর ওপর কর্তৃত্ব ফলানোর নিদান দিলেন। এর পরিণামে সমাজে এই উচ্ছৃঙ্খল জনতার ভিড়ের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেলে অভিজাতশ্রেণী একটা সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়। পরিস্থিতি এমন জায়গায় যায় যে কেউ সহিংস আক্রমণের হুমকি দিলে বা ভীতি প্রদর্শন করলে হুমকি প্রাপকের কাছে হুমকিদাতার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা ছাড়া আর কোনো রাস্তা খোলা থাকত না। বার্নহ্যামের মত অনুযায়ী এই মার্ক্সবাদ, সাম্যবাদ বা বামপন্থার নীতিসমূহ দ্বন্দ্বাত্মক আদর্শ বহির্ভূতও বটে। রজার কিম্বলের লেখা 'সুইসাইড অফ্ দ্য ওয়েস্ট' বইটির ভূমিকায় (বইটির ইলেকট্রনিক বা কাইন্ডল্ সংস্করণের ১১ নং পৃষ্ঠায়) বার্নহ্যাম লিখেছেন যে, বামপন্থা কেবলমাত্র একটি হাতিয়ার বা যন্ত্র, যার দ্বারা ঘোষিত হয় যে যারা কমিউনিস্টদের শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষে ক্রিয়াশীল থাকে, তারাই একমাত্র সাচ্চা ও খাঁটি মানুষ!

বর্তমানে পশ্চিমি দুনিয়ার শাসনকর্তারা হলো লিবারেল মার্ক্সবাদী। তাদের মধ্যে নীতি-নৈতিকতার লেশমাত্র নেই। বামপন্থা অনুযায়ী এরা পরিচালিত হয়। এই কারণে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য তাদের নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের নিয়ে বামপন্থীরা প্রথম সংগঠন করা শুরু করে। বাম চিন্তাধারা অনুযায়ী, শিল্পক্ষেত্রে কারখানাগুলিতে কর্মরত শ্রমিকরা যেহেতু শোষণের শিকার, সেই জন্য প্রয়োজনে তাদের সহিংস আন্দোলনে শামিল হওয়ার অধিকার আছে। নীতি-নৈতিকতার সাধারণ আইন-কানুন তাই তাদের ওপর কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয়। এই শ্রমিকরা শিল্প-ইউনিটগুলোতে ধরনা দিতে পারে, সেখানে ভাঙচুর চালাতে পারে, এমনকী শোষিত হওয়ার কারণে কারখানার মালিককে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। এহেন ধ্বংসাত্মক মতাদর্শের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ক্ষমতাসীন অভিজাতশ্রেণী হার মেনে নিল, তাদের মনে ভয় ঢুকলো যে শিল্পাঞ্চলের কারখানাগুলোতে এই শ্রমিকদের সংগঠন করার, তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য সব রকম উপায় অবলম্বনের অধিকার না দিলে তারা মিছিল করে এসে সংসদ ভবন ঘেরাও করতে পারে। এমনকী এই অরাজক শক্তি

সেখানে অগ্নিসংযোগ পর্যন্ত করতে পারে।

আইনকানুনের হাত থেকে বামপন্থীদের রেহাই দেওয়ার ব্যাপারে এটিই হলো সমাজের সভ্য শ্রেণী প্রদত্ত প্রথম ছাড় এবং সেই থেকে আইনের শাসনের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের সূত্রপাত হয়। এইভাবে পশ্চিমি দেশগুলিতে শিল্প ইউনিটগুলি একে একে বন্ধ হতে থাকে এবং সমাজে আর্থিকভাবে পরনির্ভরশীল একটি শ্রেণীর উদয় হয়। কর্মক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কাজে লিপ্ত থাকার মধ্যে একটি অসাধারণ গুণ থাকে। সেই কাজের মাধ্যমেই কর্মরত লোকজনের চরিত্র গঠন হয়ে থাকে। কিন্তু কর্মহীনতা সৃষ্টির ফলে, শুধু জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের দ্বারা চালিত হওয়ার দরুন পশ্চিমি লোকজনের মধ্যে সেই চরিত্রের অবলুপ্তি ঘটে। এর সঙ্গে চারিদিকে এই বার্তাও ছড়িয়ে পড়ে যে কেউ শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত শ্রেণীভুক্ত হলে আইনকানুনের হাত থেকে এই অব্যাহতি তার বা তাদের ওপর প্রযুক্ত হবে। এই কায়দায় এই তথাকথিত উদারবাদী (লিবারেল)-রা সমাজের মধ্যে একটি নিপীড়িত শ্রেণীকে প্রস্তুত করতে শুরু করে এবং লোকজনও সানন্দে তাদের এই কর্মসূচিতে যোগদান করতে থাকে। কে আর নীতি-আদর্শ, আইন-কানুনের বোঝা বইতে চায়? সমাজের খুব কম লোকই অর্থের প্রবাহ সম্পর্কে সম্যক ধারণার অধিকারী। এমনকী অনেক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদও অর্থ প্রবাহের গতিপথ নির্দেশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সহিংস আক্রমণ না ঘটলে সেই অর্থের স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয় না। তাই সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রে অর্থের স্রোত তথা সামাজিক সমৃদ্ধি ও বামপন্থা একে অন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

পশ্চিমি শক্তির সবচেয়ে বড়ো ভুল: পশ্চিমের যাবতীয় সমৃদ্ধি ছিল— সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত অধিকার, ব্যবসার স্বাধীনতা ও বাক্‌স্বাধীনতা আধারিত। সত্যনিষ্ঠাসম্পন্ন, চরিত্রবান, উচ্চ ও মহান ধ্যানধারণাসম্পন্ন ব্যক্তিরা সেই অধিকার প্রদান করে গিয়েছিলেন। কার্ল মার্ক্স দাবি করলেন যে সমাজের এইসব সম্পদ শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি। মার্ক্সবাদের অনুগামীরা বিভিন্ন জায়গায় হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু করলে পশ্চিমি নৈতিকতা-মূল্যবোধের সেই কাঠামো ভেঙে পড়ে। দুর্নীতিগ্রস্ত, ভ্রষ্টাচারী অভিজাতশ্রেণী তখন পশ্চিমি দেশগুলিতে ক্ষমতাসীন। তারা দুর্নীতি বন্ধ করার পরিবর্তে নীতি-নৈতিকতার সাড়ে সর্বনাশ ঘটালেন এবং প্রকারান্তরে শ্রমিকদের এই হিংসাত্মক, অরাজক আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিল। এর ফলে অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা দুর্নীতি সমাজের একদম নীচু স্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এমনকী এই দুর্নীতি গ্রাস করল বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরও।

আজ বিজ্ঞান ও গবেষণা ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠার অন্তরালে এক সংগঠিত প্রতারণাচক্র চালিয়ে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে বিকৃতির সঞ্চার করে চলেছে। বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত একজন শল্যচিকিৎসক বা সার্জেন ভালোভাবেই জানেন যে ৩৭.২ লক্ষ কোটিরও বেশি কোষের সমন্বয়ে মানবদেহ গঠিত। প্রতিটি ব্যক্তির লিঙ্গ নির্ধারণ এই কোষসমূহের সম্মিলিত ক্রিয়া-বিক্রিয়ারই ফলাফল, এবং যে কোনো সার্জারি বা সেই সংক্রান্ত পরামর্শ এই জীববিজ্ঞানগত ক্রিয়ার পরিপন্থী। কিন্তু এরপরেও এই সার্জেনরা সার্জারির দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তির যৌনাঙ্গের পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছেন; প্রতারণার ফাঁদে পড়ে সার্জারির শিকার সেই সব ব্যক্তিরাও আনন্দের সঙ্গে তাদের শরীরের ওপর এই কাটাছেঁড়া ও এই ঘৃণ্য প্রতারণা মেনে নেন। বাস্তবে, গোটা পশ্চিমের মৃত্যু সেই দিনই ঘটে গিয়েছে যখন লিঙ্গ পরিবর্তনের নামে চলা এই আধুনিকতম প্রতারণাচক্রের প্রথম শিকার ডেভিড রাইমার আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। প্রখ্যাত চিকিৎসক ও মনোবিদ ডাঃ জন উইলিয়াম মানি সেই সার্জারিটি করেছিলেন।

কাফের বা বিধর্মীদের দুর্বলতাই ইসলামের শক্তির উৎস: বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ার পরিণামে জন্ম হয় 'জলবায়ু পরিবর্তন' নামে এক নতুন প্রতারণার। এই ব্যাপারটি ইসলাম ও ব্ল্যাক ম্যাজিকের মতোই আরেকটি মহামারী যা পশ্চিমকে গিলে খাচ্ছে। যেসব লোকজন 'জলবায়ু পরিবর্তন'-এর পিছনে লুকিয়ে থাকা সত্য উদ্‌ঘাটন করে চলেছেন, ডেভিড রাইমারের মতোই তাদেরকেও শেষ করে দেওয়ার খেলা চলছে। আইনের অপপ্রয়োগ করে তাদের জীবিকাচ্যুত করা চলছে। এইসব অত্যাধুনিক প্রতারণার বিরুদ্ধে কিন্তু কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। আজ ধনী ও লিবারেল শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা ব্যক্তিগত জীবনে চূড়ান্ত অসফল এবং কোনো রকম গঠনমূলক কাজে অক্ষম। কিন্তু এই দেশগুলির রাজনীতি, শিক্ষা, মিডিয়া বা সংবাদমাধ্যম এবং কর্পোরেশনগুলির মানবসম্পদ ও অন্যান্য বিভাগগুলিতে এই অসফল ও অদক্ষ লোকজনেরই সংখ্যাধিক্য। নীতিহীন, চরিত্রহীন এইসব লোকজন ব্যবসা ও অর্থনৈতিক কারবারগুলিকে করে তোলে অলাভজনক। বিজ্ঞান ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত এই ধরনের লোকজন শিক্ষা-গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অনুদান নয়ছয়ে সিদ্ধহস্ত। সার্ভিস সেক্টর বা পরিষেবা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত লোকজন (চাকরি যাদের পেশা)— তাদের নিয়ন্ত্রণ করা থেকে শুরু করে বিচারকদের নিযুক্তি, স্কুলগুলিতে শিশুদের শিক্ষাদান এবং সংবাদমাধ্যমের দ্বারা অপপ্রচার, সবকিছুই করে চলেছে এই দুর্নীতিগ্রস্ত শ্রেণী। এইসব লোকজন সমাজে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়াও অন্য দুর্নীতিগ্রস্তদের বাঁচাতে সদা তৎপর। এই আপাদমস্তক ভ্রষ্ট পশ্চিমি অভিজাতশ্রেণীর শাসনের কারণে ইসলাম আজ গোটা পশ্চিম জুড়ে আড়েবহরে বেড়ে উঠেছে। এই নীতিহীন ভ্রষ্ট বিধর্মী (ইসলামের চোখে কাফের) অভিজাতশ্রেণী অপেক্ষা কোনো কিছুই ইসলামের কাছে অধিকতর প্রিয় নয়। গোড়ার দিকে, ইসলাম হাতে হাত মিলিয়ে চলে সব রকম সমর্থন দিতে থাকে। কিন্তু ক্ষমতার অলিন্দের বাইরে থাকলেও অভিজাতশ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াইয়ের সুযোগে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে ইসলাম। তারপর একটা দিন আসে যখন এই অভিজাতশ্রেণীকে সমূলে উৎপাটিত করে খতম করে ইসলাম। 'কাফের সমাজের' এই আভ্যন্তরীণ মতভেদই ইসলামের শক্তির মূল উৎস। ইসলাম সেই লোকগুলিকে নির্বাচন করে, তাদেরকে লালনপালন করে, টাকাপয়সা দিয়ে সবরকম তোল্লাই দেয় যারা বিধর্মী সমাজে এই 'মতভেদ' সৃষ্টি করে এবং সমাজের ভিতরে 'ফল্ট লাইন' বা চ্যুতিরেখা সৃষ্টি করে আড়াআড়িভাবে সামাজিক বিভাজন ঘটায়। এই বিভাজনের পূর্ণ সুযোগ নেয় ইসলাম। এই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করে দেশগুলির সমাজে ধ্বংসের বীজ বপন করে সেই দেশের সমাজকে শেষ করে ইসলাম।

(লেখক ইংল্যান্ডবাসী একজন সমাজচিন্তক)

পাক-আফগান সীমান্তে খাইবার-পাখতুনওয়া প্রদেশে ফের হিন্দু মন্দির ধ্বংস প্রশাসনের মদতে

ফের খবরের শিরোনামে পাক আফগান উত্তর- পশ্চিম সীমান্তবর্তী খাইবার- পাখতুনওয়া প্রদেশ। পাকিস্তানের এই অঞ্চলে ভাঙা পড়লো আরও একটি ঐতিহ্যবাহী হিন্দু মন্দির। পাকিস্তানে হিন্দু-নির্যাতন কিংবা খাইবার-পাখতুনওয়া প্রদেশে হিন্দু মন্দির ধ্বংস অবশ্য নতুন নয়। প্রসঙ্গত, অধুনা পাক-প্রশাসনের অন্তর্গত এই প্রদেশে বহু দুর্মূল্য হিন্দু ঐতিহ্যর নিদর্শন পাওয়া যায়।

কয়েক বছর আগে সেই প্রদেশের কারাক জেলায় হিন্দু মন্দির ধ্বংসের ভিডিয়ো ভাইরাল হতে সমালোচনার মুখে পড়েছিল তৎকালীন ইমরান প্রশাসন। এই ঘটনার কড়া প্রতিক্রিয়া জানায় ভারতও। ভারতের তরফ থেকে কূটনৈতিক স্তরে সেই প্রতিবাদ বার্তা পৌঁছেও দেওয়া হয়েছিল ইসলামাবাদের কাছে। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তাই সুর নরম করতে বাধ্য হয় সেদেশের প্রশাসন। যে মন্দির ভেঙে তছনছ করা হয়েছিল, তা দ্রুত সারিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় পাক-প্রশাসন। প্রশাসনের তরফ থেকে এমনটাই আশ্বাস দিয়েছিলেন পাখতুনখোয়া প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মাহমুদ খান। কিন্তু দায়সারা গোছের মন্দির সংস্কার করে মাহমুদ-প্রশাসন।

২০২০ সালের ডিসেম্বরে জমিয়ত উলেমা-ই-ইসলাম-ফজল পার্টির নেতার নেতৃত্বে একদল হিন্দু বিদ্বেষী খাইবার পাখতুনওয়া প্রদেশের তেরি গ্রামের ওই মন্দিরে তাণ্ডব চালিয়েছিল। ভাঙচুরের সেই ঘটনার পরে পাক সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি গুলজার আহমেদের নির্দেশে মন্দিরটি পুনরুদ্ধার করেছিল পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ। আহমদ পরে সেই মন্দিরে গিয়ে দীপাবলি উদ্‌যাপনও করেছিলেন। পেশোয়ার-প্রশাসনের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছিল যে, হিন্দু সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতেই এমনটা করেছিলেন প্রধান বিচারপতি এবং পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ থেকে আসা তীর্থযাত্রীদের স্বাগতও জানিয়েছিলেন তিনি।

এবারে কয়েকদিন আগে সরাসরি প্রশাসনিক উদ্যোগে খাইবার পাখতুনওয়া প্রদেশের লেন্ডি কোটাল বাজারে একটি ঐতিহ্যবাহী হিন্দু মন্দির ভেঙে ফেলেছে পেশোয়ার প্রশাসন। সূত্রের খবর, এই মন্দিরের জায়গায় একটি বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শুরু হচ্ছে। দেশভাগের সময় লেন্ডি কোটাল বাজারে বসবাসকারী হিন্দুরা ভারতে চলে এসেছিল। এর ফলে, বছরের পর বছর ধরে সঠিক পরিচর্যার অভাবে এটি ধীরে ধীরে দুর্বল-কাঠামো হয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। এর ফলে ওই ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটি আর না রেখে, তা ভেঙে গত কয়েকদিন ধরে একটি কমপ্লেক্স তৈরি করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

যদিও পেশোয়ারের প্রশাসনিক দপ্তরের কর্মকর্তারা হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্বের কথা পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। যদিও লেন্ডি কোটালের বিশিষ্ট সাংবাদিক ইব্রাহিম শিনওয়ারির দাবি, ঐতিহাসিক মন্দিরটি মূল লেন্ডি কোটাল বাজারের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল, যা স্থানীয় হিন্দুদের প্রতিবাদের পর ১৯৯২ সালে ভারতের অযোধ্যায় বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের সুযোগে কিছু আলেম ও শেমিনারিয়ানদের কারণে মন্দিরটি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাই লেন্ডি কোটালে 'খাইবার মন্দির' নামে একটি মন্দিরের যে ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

পাকিস্তান হিন্দু মন্দির ব্যবস্থাপনা কমিটির হারুন সর্বদয়াল জোর দিয়েছিলেন যে যাঁরা মুসলমান নন, তাঁদের ধর্মীয় গুরুত্বের দিকে তাকিয়ে এই ঐতিহাসিক ভবনগুলির সুরক্ষা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা ছিল প্রদেশ-প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের দায়িত্ব। তাঁর দাবি, প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর বিভাগ, পুলিশ, সংস্কৃতি বিভাগ এবং স্থানীয় সরকারের ২০১৬ সালের পুরাকীর্তি আইন দ্বারা উপাসনালয়-সহ এই ধরনের স্থানগুলিকে রক্ষা করার কথা ছিল। সর্বদিয়াল পরামর্শ দিয়েছিলেন, যে যে জায়গাগুলি হয় সংখ্যালঘুদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় না বা জরাজীর্ণ সেগুলিকে ভেঙে ফেলার পরিবর্তে সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। ডন পত্রিকা ল্যান্ডি কোটালের সহ-কমিশনার মুহাম্মদ ইরশাদকে উদ্ধৃত করে, মন্দিরটি ভেঙে ফেলার বিষয়ে তাঁর না-জানা উদ্ধৃত করে জানিয়েছে যে খাইবার উপজাতীয় জেলার সরকারি জমি রেকর্ডে মন্দিরের কোনও উল্লেখ নেই। ল্যান্ডি কোটাল বাজারের পুরো জমিই ছিল রাজ্যের অধীনে। মন্দিরের জায়গায় নির্মাণ কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত নন তিনি।

ওই আধিকারিক আরও জানান যে, লেন্ডি কোটাল বাজারে কিছু পুরনো দোকান সংস্কার ও মেরামতের জন্য নির্মাতাকে 'অনাপত্তি সনদ' দেওয়া হয়েছিল। এরপর পৌর কর্তৃপক্ষ উপজাতীয় জেলার সমস্ত বাণিজ্য কেন্দ্রে বাণিজ্যিক ভবন বা দোকান তৈরির অনুমতি দিয়েছে।

ভাবের ঘরে চুরির এই প্রবণতা পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের বিপদ আরও বাড়াবে ও হিন্দু ঐতিহ্যর বিপদ আরও ডেকে আনবে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। ☐

ভ্রষ্টাচারীদের ছাড়বে না আদালত

অসিত চক্রবর্তী

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (২০০৫) সমীক্ষা অনুসারে ৬২ শতাংশের বেশি ভারতীয়কে কোনো না কোনো সময়ে সরকারি কাজে সরকারি কর্মীকে ঘুষ দিতে হয়েছে। ভারতে ভ্রষ্টাচার নতুন কোনো বিষয় নয়। বহুদিন ধরেই কুরে কুরে খাচ্ছে দেশকে। যতদিন যাচ্ছে ততই যেন বেড়ে চলেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (২০২৩) সমীক্ষা মতে দুর্নীতির ক্ষেত্রে ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৯৩। সেই অনুসারে দুর্নীতিতে চীনকেও ছাড়িয়ে গেছে ভারত। তবে আশার কথা, আগের থেকে তুলনায় অনেকটাই ভ্রষ্টাচার কমেছে ভারতে। কমে আসার কারণ অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া পদক্ষেপ। আসলে দুর্নীতি দমন ব্যাপারটাই দমনমূলক অ্যাকশন। কড়া না হলে হবে কেমন করে? তবে এটাও ঠিক, শাসনের ভয়ে রাষ্ট্রচরিত্র নির্মাণ হয় না, সমৃদ্ধ নাগরিক চরিত্র নির্মাণ হয় না। তা হয় উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা। অনুশাসনের দ্বারা, সংস্কারের দ্বারা। আমাদের সে রকম শিক্ষা ব্যবস্থা এতদিন চালু হয়নি। নতুন শিক্ষানীতি হয়তো সে অভাবটা পূরণ করবে।

লোকসভা নির্বাচনের (২০২৪) সূচি ঘোষণা হয়ে প্রথম দফার নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে গেছে। নির্বাচনী প্রচারে দেশ এখন সরগরম। ভ্রষ্টাচারের দায়ে জড়িত ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেনের মতো অনেক নেতাই এখন জেলে। কেউ কেউ জামানতে জেলের বাইরে এসে নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত। লালুপ্রসাদ যাদব অসুস্থতার জন্য চিকিৎসার সুবিধা চেয়ে হাইকোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। এখন দিব্যি নির্বাচনী প্রচারে মত্ত। চষে বেড়াচ্ছেন এক একটি নির্বাচনী এলাকা। অথচ আদালতে বলেছিলেন, তিনি চলতে ফিরতে অসুবিধা বোধ করছেন। যে কোনো সময় শারীরিক কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। অসাধু উপায়ে এভাবে জামিন আদায় করাও আরেক প্রকার ভ্রষ্টাচার। এই অসাধু প্রক্রিয়ায় হাইকোর্ট থেকে জামিন আদায় করাটা আজকাল প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যেন সাংবিধানিক অধিকার। অসুস্থতার জন্য জামিনের আবেদন করলে সাধারণত হাইকোর্ট খারিজ করে না। এভাবে অনেক নেতাই আগাম জামিন নিয়েছেন বা চেষ্টা করছেন। তারা হলেন পি চিদাম্বরম, লালুপ্রসাদ, অনিল দেশমুখ, নবাব মালিক, এম চন্দ্রবাবু নাইডু, সিপি ঠাকুর প্রমুখ। সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধীও জামিনেই বাইরে আছেন।

পি চিদাম্বরম রাজ্যসভার সংসদ সদস্য। এক সময়কার ইউপিএ সরকারের অর্থমন্ত্রী। ভারতের এক সম্মানজনক গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করা ব্যক্তিত্ব। অথচ তিনিও আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় অভিযুক্ত হন। কয়েদি জীবন থেকে রেহাই পেতে দিল্লি হাইকোর্টে নিজের অসুস্থতার মিথ্যা ভান করে জামিন চান। তিনি নাকি পেটের ব্যথায় বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন। তাই এইমসের ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী হায়দরাবাদে চিকিৎসা করাবেন। এইমস্-এর ডাক্তারকে কথা বলে সত্যতা যাচাই করে নিতেও আদালতকে বলে বসেন। তিনি ভাবতে পারেননি আদালত সে খবর নেবে। এইমসের চিকিৎসক তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে সুপারিশ করাতে সেটা বুমেরাং হলো। জামিনে মুক্ত হবার সুযোগটা হাতছাড়া হলো। এসব অসাধু, মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াটাও তো এক প্রকার ভ্রষ্টাচার। যেখানে আইন প্রণয়ন হয়, যাঁরা করেন, তাঁরাই যদি কাগজে-কলমে আইনি পদ্ধতিতে এরূপ অসাধু উপায় নেন, তাহলে এদেশের জনসাধারণ কাকে বিশ্বাস করবে? এ তো দেশের জন্য লজ্জার! কেলেঙ্কারির উপর কি কেলেঙ্কারি নয়? খুনের মামলায় অভিযুক্ত, চারবার জয়ী উত্তরপ্রদেশের বিধায়ক অমরমণি ত্রিপাঠী বছরের পর বছর অসুস্থতার ভান করে হাসপাতালে কাটিয়ে দেন।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এখন সরাব ঘোটালা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে তিহার জেলে হাজতবাস করছেন। নেতাই হোন, আর সাধারণ মানুষই হোন, সবাই নিজেকে নির্দোষ বলে জাহির করেন। রাজনৈতিক নেতারা তো মিডিয়াতে গলা ফাটিয়ে নিজেকে নির্দোষ এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের চক্রান্ত বলে প্রচার চালিয়ে যান। তাদের শাগরেদরাও তাই করেন। এটিও পুরোনো রাস্তা। সেই পুরানো রাস্তাতেই এগোচ্ছেন কেজরিওয়াল। আপ নেত্রী অতসী সম্প্রতি কেজরিওয়ালের জামিনের জন্য সেই ক্ষেত্রটিই প্রস্তুত করতে ব্যস্ত। মিডিয়াতে বার বার বলছেন, কেজরিওয়ালকে অসুস্থ জেনেই অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তার ওজন মাত্র বারো দিনে চার কেজি কমে গেছে। তার সুগার লেভেলও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় এসেছে। এই বিষয়গুলিকে ইস্যু বা হাইলাইট করা হচ্ছে। অথচ তিহার জেলের রুটিন মাফিক মেডিক্যাল টেস্ট কিন্তু সেকথা বলছে না। তার সুগার লেভেল, ব্লাড প্রেসার ও ওজন একেবারে স্বাভাবিক। যেমনটি তিহার জেলে ঢোকার সময় মেডিক্যাল টেস্টে পাওয়া গেছিল,

এক মাফিয়া ডনের মৃত্যুতে কংগ্রেস, সমাজবাদী দল, বিএসপি প্রভৃতি বিরোধী দল বা ইন্ডি জোটের নেতাদের শোকপ্রকাশ দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। জানাজার জনসমাবেশে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি দেখে মনে হয়েছে যেন এক দেশনায়কের মৃত্যু হয়েছে।

ফঃ ২

তেমনটাই আছে। অর্থাৎ যখন তারা বুঝে নিয়েছেন কোর্ট তাদের ছাড়ছে না তখন সেই পুরানো অসাধু রাস্তাতেই জামিনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এক ভ্রষ্টাচারে কারাবাস, আবার আরেক ভ্রষ্টাচারকে উপায় ধরে জামানত। এই হলো আদর্শতাবাদের ধ্বজাধারী নেতাদের আদর্শ মুখোশ।

২০১৫ সালে এক মিটিঙে কেজরিওয়াল বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন— আপ দলের কোনো মন্ত্রী, বিধায়ক, পার্টি সদস্য— যে কেউ হন না কেন, দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হলে প্রত্যেককে জেলে যেতে হবে। তিনি নাম ধরে মণীশ সিসৌদিয়া, সত্যেন্দ্র জৈন, সঞ্জয় সিংহ এমনকী নিজেও যদি অভিযুক্ত হন, তাহলে তিনি নিজেও জেলে যাবেন। নিয়তির পরিহাসে আজ এরাই জেলে। তা আবার ভ্রষ্টাচারের দায়ে। কিন্তু তাদের উপর ওঠা দুর্নীতির অভিযোগকে তারা মেনে নিতে পারেননি। শাসক দলের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র বলে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে মিডিয়াতে বা সভা সমিতিতে বক্তব্য রাখছেন। তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতিই আজ তাঁকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে জর্জরিত করেছে। তাঁকে হাসির খোরাক করেছে।

ইডি-কে প্রধানমন্ত্রীর দালাল বলে এখন আপ নেতারা তোপ দাগছেন। কী আশ্চর্যের বিষয়, ২০১৫ সালে এই কেজরিওয়ালই বলেছিলেন, সোনিয়া গান্ধীকে ইডি-র কাস্টোডিতে দু'দিন রেখে ঠিকমতো জেরা করলে সব দুর্নীতি বেরিয়ে আসবে। আর আজ সেই কেজরিওয়ালই ইডি-র কাস্টোডিতে। আর তাঁর স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল এখন সোনিয়া গান্ধীর অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ। এখন বলছেন ইডি মোদীর দালাল; ষড়যন্ত্রকারী। তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে। রামলীলা ময়দানে ইন্ডি জোটের সমাবেশে তাঁদের দুজনের পাশাপাশি অবস্থান সেই ধারণারই পুষ্টিসাধন করে। এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসে, আজ থেকে দশ বছর আগে কেজরিওয়াল বলেছিলেন, সংসদ থেকে ভ্রষ্টাচারীদের সাফা করা হোক। কাদের সাফা করা হবে? তার কিছু নাম তিনি সেদিন উল্লেখ করেন। ইন্ডি জোটের রামলীলার সভায় ভিআইপি সমাবেশে মঞ্চে তাদের হাতে আপের নেতারা হাতে হাত রেখে বন্ধুত্বের অটুট শক্তি প্রদর্শন করলেন। এভাবেই ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনে দুর্নীতিবাজ নেতারা এককাট্টা হয়ে লড়তে চাইছেন। নরেন্দ্র মোদীর কথায়, আমি যত বলি ভ্রষ্টাচার হটাও, তারা বলে ভ্রষ্টাচারী বাঁচাও।

সম্প্রতি আপ নেতা সঞ্জয় সিংহ তিহার জেল থেকে জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। ছাড়া পেতেই আপ কার্যকর্তারা যেন মেতে উঠলেন বিজয় উৎসবে। জামিনে মুক্ত হওয়া মানে নির্দোষ প্রমাণিত নয়। আইনের দৃষ্টিতে তিনি এখনো একই অপরাধে অভিযুক্ত। এটা জেনেও না জানার ভান করা হচ্ছে। তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করা হচ্ছে। তাঁকে যেভাবে ফুলের মালায় ভূষিত করে তুলসীপাতার মতো পবিত্র চেহারা তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে তাতে এটা স্পষ্ট যে এসব মানুষকে বোকা বানানোর এক রাজনৈতিক নাটক মাত্র। কিন্তু সাধারণ মানুষও জানেন, জামিনে ছাড়া পাওয়া মানে নির্দোষ প্রমাণ হওয়া নয়।

লালুপ্রসাদকেও এভাবে মালা পরিয়ে জেলের বাইরে বরণ করা হয়েছিল। এখন আপ দলের পেছনের স্ক্রিনে কেজরিওয়ালের ছবিকে কয়েদি হিসেবে দেখানো হচ্ছে। দেখলে মনে হবে যেন ক্ষুদিরাম কিংবা দীনেশের ছবি। যেন দেশের জন্য আত্মবলিদানকারী এক মহাপুরুষের ছবি। এখানে বলে নেওয়া ভালো, কেজরিওয়াল দেশের কাজের জন্য জেলে যাননি, দেশের টাকা লুঠের অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে জেলে গেছেন। তাঁর উপর আরোপিত অভিযোগ আদালতে শক্তপোক্ত ভাবে বিচারযোগ্যতার মান্যতা পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে নেওয়া ভালো, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাক বা না যাক— ফুলের মালা দিয়ে অন্তত ভ্রষ্টাচার ঢাকা যায় না।

কেজরিওয়ালকে প্রধানমন্ত্রী মোদী জেলে ঢুকিয়েছেন— আম আদমি পার্টি এই বলে মিডিয়াতে প্রচার চালাচ্ছে। তারা আওয়াজ তুলেছে— 'জেলকা জবাব ভোটসে'। অথচ আদালত বলছে, কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি যুক্তিসঙ্গত। তাই আদালতের আইনি প্রক্রিয়াতে তিনি হাজতবাস করছেন। আদালতের কাছে তিনি একজন আম আদমি। অথচ কেজরিওয়াল নিজে আম আদমি পার্টি বানিয়ে নিজেকে আম আদমি ভাবতে পারছেন না। তিনি ভিআইপি-র সুবিধা চাইছেন। হাইকোর্ট স্পষ্ট বলে দিয়েছে কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তার ন্যায়সংগত। ইডি-র সামনে নয়, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে রাখা বক্তব্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই ভ্রষ্টাচারের সত্যতা সামনে এসেছে। এতকিছুর পরেও আপ নেতারা নিজেদের গায়ের জোরে যেন নির্দোষ বলতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

মুখতার আনসারি নামক উত্তরপ্রদেশের একাধিকবার নির্বাচিত এক বিধায়ক জেলে আকস্মিক মারা যায়। সে বড়ো বড়ো ভ্রষ্টাচার, জমিদখল, বেআইনি অস্ত্র রাখা, দাঙ্গা বাঁধানো এমনকী একাধিক খুনের মামলায় অভিযুক্ত। অথচ এই মাফিয়া ডনের মৃত্যুতে কংগ্রেস, সমাজবাদী দল, বিএসপি প্রভৃতি বিরোধী দল বা ইন্ডি জোটের নেতাদের শোকপ্রকাশ দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। জানাজার জনসমাবেশে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি দেখে মনে হয়েছে যেন এক দেশনায়কের মৃত্যু হয়েছে। এক কুখ্যাত ভ্রষ্টাচারী হওয়া সত্ত্বেও তার পেছনে নেতাদের মদত ও জোটবাঁধা আসলে ভ্রষ্টাচারীদের প্রশ্রয়দানই হচ্ছে।

এভাবেই এবারের নির্বাচনের প্রাক্‌মুহূর্তে দুর্নীতিবাজরা ইন্ডি জোটে একত্রিত হয়ে বাঁচতে চাইছেন। বিরোধীরা বলতে শুরু করেছেন, এসব শাসকদলের স্বৈরতন্ত্র। বিরোধীদের জেলে পুরে শক্তিহীন করে দেওয়া। এসব রাজনৈতিক চক্রান্ত। এভাবে প্রত্যেকটা দল, শাসক কিংবা বিরোধীদের যদি দুর্নীতির দায়ে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, তাহলে লাভ হবে দেশবাসীর। ভ্রষ্টাচারীদের জন্য ভ্রষ্টাচার কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ভ্রষ্টাচার বার বার রাজনৈতিক ইস্যু হোক। ভ্রষ্টাচারীদের উপর শাসক দলের তানাশাহি শাসন চলুক। তা যে দলই শাসক হোক না কেন।

দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী নিজে জেলে যাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। আজ অভিযোগ উঠার পর স্বেচ্ছায় জেলে যাওয়ার মতো হিম্মত দেখাতে পারেননি। ইডি-র সঙ্গে সহযোগিতা করেননি। বার বার ইডি-কে এড়িয়ে গেছেন। লালকৃষ্ণ আদবানী যা পেরেছেন তিনি তা পারলেন না। তিনি মুখ্যমন্ত্রী কিংবা পার্টির দায়িত্ব, কোনো কিছুতেই ইস্তফা দেননি। উলটে তাঁর দল এবং তাঁর স্ত্রী শাসক দলের চক্রান্ত বলে চিৎকার করছেন। পুরোনো ব্যবহৃত মোবাইল কোথায় তার হদিশ দিচ্ছেন না। শুধু তিনি একা নন, মণীশ সিসৌদিয়া, সঞ্জয় সিংহ, সত্যেন্দ্র জৈনরা আগের ব্যবহার করা মোবাইলের হদিশ লোপাট করে সৎ সাজার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আদালত তাদের কিছুতেই ছাড়বে না। ☐

এনআইএ-র ওপর হামলার অর্থ দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সম্প্রতি একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে প্রশ্নটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তা হলো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে রয়েছে না আলাদা কোনো দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে? কেন তাঁরা এ প্রশ্ন তুলেছেন তারও ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কিছুদিন আগে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দুর্নীতির দায়ে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ইডি-র হাতে গ্রেপ্তার হলেও ওই দুই রাজ্যে তদন্ত-সংস্থার আধিকারিকদেরকে শাসক দলের সমর্থক বা দুষ্কৃতীদের হাতে হামলার শিকার হতে হয়নি। অথচ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তো দূরের কথা মুখ্যমন্ত্রীর পোষিত (লোকে বলে) সন্ত্রাসীদের ধরতে গেলে তদন্ত সংস্থার আধিকারিকদের আক্রান্ত হতে হচ্ছে।

৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে শেখ শাজাহানকে ধরতে গেলে রোহিঙ্গা এবং অন্য সন্ত্রাসীদের হাতে ইডি আধিকারিক, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান এবং সংবাদমাধ্যমের লোকেরা যেমন আক্রান্ত হয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে ওই ঘটনার একমাসের মধ্যে মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে বিস্ফোরণ কাণ্ডের তদন্তে গিয়ে গত ১৩ এপ্রিল ভোরে হামলার মুখে পড়েছে এনআইএ। তাদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে এবং এনআইএ-র এক আধিকারিক আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আক্রমণকারীদের পুরোভাগে ছিলেন মহিলারা।

ঘটনা হলো, ২০২২ সালের ২ ডিসেম্বর ভূপতিনগর থানার নায়ড়াবিল গ্রাম রাত ১১টা নাগাদ তীব্র বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে। সেই ঘটনায় তৃণমূলের বুথ সভাপতি রাজকুমার মান্না, তাঁর ভাই দেবকুমার মান্না ও বিশ্বজিৎ গায়েন নামে আরও এক যুবকের মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থল থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে তিনটি মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় তৃণমূল বুথ সভাপতির বাড়ির ছাদ উড়ে যায়। সেই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। পরে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তের দায়িত্ব পায় এনআইএ। এদিন সেই ঘটনার তদন্ত করতেই ভূপতিনগরে গিয়েছিলেন এনআইএ আধিকারিকরা। ভূপতিনগরের বাসিন্দা বলাই মাইতি ও মনোব্রত জানা নামে দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছিল এনআইএ। কিন্তু তাঁরা হাজিরা দেননি। সেই কারণে সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে ভূপতিনগর থানায় পৌঁছয় এনআইএ-র কয়েকজন আধিকারিক। দুই তৃণমূল নেতা বলাই মাইতি ও মনোব্রত জানাকে বাড়ি থেকে নিজেদের হেফাজতে নিলে তাঁদের ঘিরে ধরে তৃণমূল সমর্থক গ্রামবাসী। মহিলারা হাতে বাঁশ, লাঠি নিয়ে বেরিয়ে আসে। তারা গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। এক সময় তারা গাড়ি লক্ষ্য করে ইট পাথর ছুঁড়তে থাকে। তাতে ভেঙে যায় গাড়ির কাচ। ঘটনায় এক এনআইএ আধিকারিক আহত হন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের হাতের লাঠিও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হয় বলে জানা গিয়েছে।

এ রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীরা কার সাহায্যে এবং কার সাহসে নির্ভর করে রাজ্য এবং সমগ্র দেশকে জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে?

এনআইএ-র তরফে ভূপতিনগর থানায় গিয়ে গোটা ঘটনার অভিযোগ জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে ভগবানপুরের বিজেপি বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ মাইতি বলেন--- 'পশ্চিমবঙ্গে কোনো আইনের শাসন নেই। বিস্ফোরণ কাণ্ডে এনআইএ-র আধিকারিকদের গাড়িতে আক্রমণ করা হয়েছে। পুলিশ যতদিন সমাজবিরোধীদের তাঁবেদারি করবে ততদিন এমন ঘটনা ঘটতে থাকবে।'

তমলুকের বিজেপি প্রার্থী তথা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'ওরা চাইছে তদন্ত না হোক। এর ফল ভুগতে হবে। এনআইএ-র গায়ে হাত দেওয়া মানে দেশের বিরুদ্ধে কাজ করা। তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটা আমি ভারত সরকারের কাছে দাবি রাখব।'

প্রধানমন্ত্রী গত ৭ এপ্রিল জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের ধূপগুড়ির ময়নাগুড়ি জনসভা থেকে বলেছেন, 'দেশের আইন কানুন ও সংবিধানকে তছনছ করছে তৃণমূল। ওরা আইন ও সংবিধানকে পায়ের তলায় পিষতে চাওয়া একটা দল। তৃণমূল চাইছে, ওদের গুন্ডাদের সন্ত্রাস করার লাইসেন্স দেওয়া হোক। তদন্তকারীরা তদন্ত করতে গেলে তাঁদের ওপর হামলা হচ্ছে। অন্যদের দিয়ে হামলা করাচ্ছে। আইন এবং সংবিধানকে নষ্ট করার দল ওরা। সন্দেশখালিতেও আপনারা দেখেছেন, সেখানে কী হয়েছে। যখনই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তদন্তে আসে তখনই তৃণমূল তাদের ওপর হামলা করে। এখানে প্রত্যেক ঘটনায় আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। তৃণমূলকে শিক্ষা দেওয়াটা খুবই জরুরি। প্রত্যেকটি বুথে তৃণমূলের জামানত জব্দ করতে হবে।'

এই নিয়ে তিনবার এই রাজ্যে হামলার মুখে পড়ল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। গত ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি মামলায় সন্দেশখালিতে শেখ শাজাহানের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে গিয়ে হামলার মুখে পড়ে ইডি। তাতে কয়েকজন ইডি আধিকারিক গুরুতর আহত হলে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। ওইদিন বনগাঁর প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্যের বাড়িতেও রেশন দুর্নীতি মামলায় তল্লাশি অভিযানে যায় ইডি। সেদিন শঙ্করকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় হামলার মুখে পড়েন ইডি আধিকারিকরা। গাড়িতে পাথর ছুঁড়তে থাকে হামলাকারীরা। এবার তদন্তে গিয়ে গ্রামবাসীদের হামলার মুখে পড়ল এনআইএ।

এনআইএ আক্রান্ত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'নিয়ম অনুযায়ী পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। মাঝরাতে যদি গ্রামের লোক দেখেন, কিছু লোক আসছেন, তারা কীভাবে বুঝবেন? ভোটের আগে কেন গ্রেপ্তার করবে?'

মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবিকে অনেকেই ব্যঙ্গ করে বলছেন, 'ঠিকই তো, ভোটের আগে কেন গ্রেপ্তার করবে? সিপিএমের আমলে যেমন সুশান্ত, লক্ষ্মণ, মজিদ, হাতকাটা নন্টে, কানকাটা ফন্টেরা ভোটের ভবিষ্যৎ ছিল, তেমনি তৃণমূলের আমলে শেখ শাজাহান, আরাবুল, কাইজার, শঙ্কর, বলাই, মনোব্রতরাও তৃণমূলের ভোটের ভবিষ্যৎ। এরা যদি ঘরে বন্দি থাকে তাহলে ভোটবাক্স ভরাবে কে? আর তাই তো রাজ্যের পক্ষ থেকে এনআইএ-র বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করা হয়েছে থানায়। ভাবুন একবার, এরাজ্য কতটা এগিয়ে গিয়েছে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে যা আজ পর্যন্ত কেউ করে দেখাতে পারেনি, পশ্চিমবঙ্গ তা করে দেখিয়েছে।

আমাদের দেশে যতগুলি কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা আছে তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা এনআইএ। এই সংস্থার ওপর হামলার অর্থ দেশের ওপর হামলা। এটি দেশদ্রোহী কাজ। দেশের আর কোনো রাজ্যে কোনো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের ওপর কোনোদিন হামলা হয়নি। এটি রীতিমতো কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

এটা তো গেল এক দিক। এর চেয়ে মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে রাজ্যে। সেটা হলো প্রাক্তন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকে হুমকি চিঠি পাঠিয়ে বলা হয়েছে— সিএএ, এনআরসি নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে শান্তনু ঠাকুরের পরিবারের সকলকে হত্যা করা হবে এবং ঠাকুরবাড়ি উড়িয়ে দেওয়া হবে। আরও লেখা হয়েছে— সিএএ, এনআরসি লাগু হলে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা ভারতে আগুন জ্বলবে। চিঠি লিখেছে, লস্কর-ই-তৈবা নামে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের পক্ষে দেগঙ্গা থেকে।

এখন প্রশ্ন হলো, দেশের অন্য কোনো রাজ্যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীরা চুপচাপ থাকলেও এরকম হুমকি দেয় না। এ রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীরা কার সাহায্যে এবং কার সাহসে নির্ভর করে রাজ্য এবং সমগ্র দেশকে জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে? এর তদন্ত হওয়া দরকার। তবে এটা জলের মতো পরিষ্কার যে রাজ্য সরকারের সাহায্য ছাড়া এরা রাজ্যে আশ্রয় পেত না। যেমন ইতিপূর্বে দেখা গেছে এই সরকারের আমলে বাংলাদেশের মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীকে পার্কসার্কাস এলাকায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এনআইএ তাকে ধরে বাংলাদেশ সরকারের হাতে তুলে দিলে সেখানে তার ফাঁসি হয়।

নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন 'সিমি'-র প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশি নাগরিক হাসান ইমরানকে তৃণমূল সরকার রাজ্যসভার সাংসদ করে সংসদে পাঠিয়েছিল। তেমনি কয়েক বছর আগে পিএফআই নামে জঙ্গি সংগঠন রাজ্যে শুধু প্রভাব বিস্তার করেনি, খোদ রাজ্য পুলিশের সহায়তা নিয়ে মুর্শিদাবাদে বিশাল মিছিল করে বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্নেহাশ্রিত অতিথি। কাজেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরকে হুমকি চিঠি দেবে সন্ত্রাসীরা তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

এনআইএ-র ওপর আক্রমণ এবং সন্ত্রাসবাদীদের দেশ জ্বালানো হুমকির পরেও কি কেন্দ্র সরকার চুপ করে থাকবে? কেন্দ্র এরকম একটা সন্ত্রাস-প্রেমী রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে না কেন? কেন্দ্র কি রাজ্য সরকারকে ভয় পাচ্ছে? এক্ষুণি এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে ছুঁড়ে না ফেললে ২০২৬ সাল পর্যন্ত যদি এই সরকার ক্ষমতায় থাকে তাহলে সত্য সত্যই গোটা রাজ্য আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে বলে অনেকেই মত প্রকাশ করছেন।

নির্বাচন কমিশন জেগে আছে তো?

বিগত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে পশ্চিমবঙ্গবাসী কোনোমতেই নির্বাচন কমিশনের এই ফাঁপা বিবৃতি, বজ্রআঁটুনি ফসকা গেরো মার্কা ব্যবস্থার উপর ভরসা রাখতে পারছেন না। তাই আবারও বলতে হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন জেগে আছেন তো?

সাধন কুমার পাল

গত ৩ এপ্রিল, বুধবার তারাপীঠে পূজা দিতে এসে রামপুরহাটে দলীয় কর্মীদের রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে গেলেন আঞ্চলিক দল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'ভোটে পুরসভা কিংবা পঞ্চায়েত এলাকায় হারলে রেয়াত করা হবে না। ভালো ফল করলে যেমন পুরস্কার দেওয়া হবে, হারলে তেমনই তিরস্কার জুটবে। সেক্ষেত্রে ছোটো-বড়ো নেতা দেখা হবে না। দায় সবার'।

এদিন দুপুরে হেলিকপ্টারে তারাপীঠে আসেন অভিষেক। তারাপীঠের আটলা মোড়ে একটি বেসরকারি হোটেলে ওঠেন তিনি। সেখানেই কর্মীদের নিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা বৈঠক করেন। তিনি পুরসভার কাউন্সিলারদের উদ্দেশে বলেন, 'পুরসভা নির্বাচনে জিতলেও লোকসভা কিংবা বিধানসভা নির্বাচনে আমরা পিছিয়ে পড়ি কেন? তাহলেই নিশ্চয়ই আপনারা বিধানসভা, লোকসভা নির্বাচনে খাটেন না। এবার এরকম হলে আমি রেয়াত করব না। স্থানীয় নির্বাচনে তো আপনারা প্রচুর ভোটে জেতেন'। তিনি আরও বলেন, 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকলে ভোটের পর বসে মিটিয়ে নিন। কিন্তু ভোটে যেন তার প্রভাব না পড়ে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট পঞ্চায়েত নির্বাচনের আদলেই তিনি ভোট করানোর জন্য কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারে এসেও এরকম কর্মীসভা করে গেছেন এবং সেখানেও একই বার্তা দিয়ে গেছেন। তারপরেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার নির্বাচনী চিত্র পালটাতে থাকে। তৃণমূলি হার্মাদরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে প্রশাসনও। অনেক জায়গাতেই প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টিকে দেওয়াল লিখতে দিচ্ছে না, পতাকা টাঙাতে দিচ্ছে না, ফ্লেক্স টাঙাতে দিচ্ছে না, পোস্টার লাগালেও সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলছে। থানায় অভিযোগ করে কোনো লাভ হচ্ছে না। প্রশাসন দেখছি দেখব করে কাটিয়ে দিচ্ছে। অনেক জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে যে প্রশাসন নিজে থেকেই বিজেপির বিভিন্ন নেতার নামে সুয়োমোটো মামলা করছে এবং তাদের হাতে নোটিশ ধরাচ্ছে। প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নেই বললেই চলে। নামেই নির্বাচন কমিশনের হাতে প্রশাসন। আসলে রাজ্য সরকার যেমন চালাতো ঠিক তেমনি চলছে বরং আরও খারাপ ভাবে চলছে।

প্রতিবার নির্বাচন এলে হওয়া উঠে যায় যে, কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে, ভোট অত্যন্ত কড়াকড়ি হবে কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায়, হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী সংখ্যায় কম, না হলে কেন্দ্রীয় বাহিনী এলেও তাদের জেলা কেন্দ্র বা মহকুমা কেন্দ্রে বসিয়ে রাখা হচ্ছে। সেন্সিটিভ বুথ

শনাক্তকরণে রাজ্য সরকারের ধামাধরা অফিসাররা অসৎ উপায় অবলম্বন করছে। যেখানে তৃণমূল দুর্বল, বিরোধী দল শক্তিশালী, সেইসব এলাকাগুলোকে সেন্সেটিভ বুথ হিসেবে নির্বাচন করা হচ্ছে। সেন্ট্রাল বাহিনীকে রাজ্য প্রশাসনের বকলমে তৃণমূলের নেতারাই পরিচালনা করছে। বিগত প্রত্যেকটি নির্বাচনে সমস্ত ক্ষেত্রে একই চিত্র দেখা গেছে। এবারও তাই।

শুধু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নন, মমতা ব্যানার্জিও উত্তরবঙ্গে এসে লোক হচ্ছে না বলে জনসভা করার চাইতে কর্মীসভা করার ওপর বেশি জোর দিচ্ছেন। এ থেকে স্পষ্ট যে নির্বাচন নিয়ে ২০২১-এর মতো ব্যাপক কিছু ষড়যন্ত্র হচ্ছে। নির্বাচনের প্রত্যক্ষ কাজে যেসব কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে সে ব্যাপারেও বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠছে সেক্টর অফিসার হিসাবে, প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে কিংবা নির্বাচনের বিভিন্ন কাজে এমন লোকদের নিয়োগ করা হচ্ছে যারা একেবারেই তৃণমূল কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। নির্বাচন পরিচালনার কাজে প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব নির্লজ্জ নজির সৃষ্টি করেছে। এদের নামে কোথায় অভিযোগ করলে কাজ হবে এই নিয়ে বিভ্রান্ত সকলেই। বিভিন্ন জায়গায় বিরোধী দলের লোকেরাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কোথায় গিয়ে অভিযোগ করলে সুরাহা হতে পারে।

কোচবিহারের জেলাশাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি সরাসরি তৃণমূলের হয়ে কাজ করছেন। সমস্ত অভিযোগ বিশ্লেষণ করলে এবং সাধারণ মানুষের মতামত নিলে এমনটাই মনে হবে যে নামেই নির্বাচন কমিশন, সমস্ত কাজই পরিচালিত হচ্ছে রাজ্য সরকারের বকলমে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত দিয়ে। ২০২১-এর নির্বাচনে ভোট গণনার সময় দেখা গেছে, গণনাতেও ব্যাপক কারচুপি হয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী বা নির্বাচনে কমিশনের ভূমিকা ঠিক ছিল না। এবারও লোকসভা নির্বাচনে সেই আগের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সন্দেশখালির গোলমালের সময় অনেক মানুষকে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বলতে শোনা গেছে যে তারা বহু বছর ধরে ভোট দিতে পারেন না। এই পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গাতেও আছে। নির্বাচনের আগে একটা হাওয়া তোলা হয় যে এবার খুব কড়াকড়ি হবে কিন্তু নির্বাচন এলেই সেই সব কোথায় যেন উবে যায়। ফলে মানুষ চরম হতাশায় ভুগছে। মানুষ কিন্তু আর কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর ভরসা রাখতে পারছে না।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুমকি সাধারণভাবে নেওয়া যাবে না। মিডিয়াতে যতখানি কর্মী সভার খবর এসেছে তা বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় যে তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত বা পৌর নির্বাচনের মতো নির্বাচন করাতে চাইছে। হয়তো বুথে গিয়ে রিগিং করবে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ বুথ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে তো? সেজন্যই একজন সাধারণ ভোটার হিসেবে প্রশ্ন করাই যায়, নির্বাচন কমিশন জেগে আছেন তো? গত ৪ এপ্রিল মমতা ব্যানার্জি কোচবিহার জেলার মাথাভাঙার গুমানি হাটে মিটিং করেছেন। মাঠ ভরাতে পারেননি। হেলিকপ্টার নামার জন্য এলাকার বড়ো বড়ো ঐতিহ্যশালী গাছগুলো কেটে নষ্ট করেছে তৃণমূলের লোকেরা।

এই নিয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এই সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি বলেছেন, কী সংখ্যালঘু ভাই-বোনেরা খেলা হবে তো, খেলা হবে তো, খেলা হবে তো? স্পষ্টতই সাম্প্রদায়িক উসকানি। সেজন্য আবার প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে, নির্বাচন কমিশন জেগে আছেন তো? কোচবিহার শহরে ভগবান শ্রীরামকে অমর্যাদা করে দেওয়ার লিখন দেখা যাচ্ছে। এই নিয়ে জনমানসে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিলেও প্রশাসন নির্বিকার। মমতা ব্যানার্জির উসকানিও ছোটো করে দেখা উচিত নয়। বিগত দিনে বিভিন্ন ভোটে তৃণমূল সমর্থক মহিলাদের কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে হাতা খুন্তি নিয়ে রুখে দাঁড়াতে বলেছেন। তার ফলস্বরূপ শীতলকুচিতে সে ধরনের আক্রমণের ঘটনাও ঘটেছে। মমতা-অভিষেক দুজনে মিলে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত নির্বাচন পরিস্থিতিকে একটা ভয়ংকর হিংসাত্মক পরিস্থিতির দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন। 'লোকসভা ভোট মিটে গেলে নির্বাচন কমিশন থাকবে না তখন তো আমরাই সব। এখন কথা না শুনলে পরে দেখে নেওয়া হবে'— এই ভয় দেখিয়ে প্রশাসনকে দিয়ে অবলীলাক্রমে এই সমস্ত কাজ করাতে পারছে। শুধু এবার কেন, প্রতিটি নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জি এই ধরনের ব্ল্যাকমেলিং করে থাকেন।

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের দিন শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে পাঁচ জনের মৃত্যু নিয়ে তখনকার এসপি দেবাশিস ধর কিছু সত্য কথা বলে ফেলেছিলেন। তার জন্য তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে কম্পালসারি ওয়েটিঙে রেখে বসিয়ে দেওয়া হয়। দিনের পর দিন সেই অফিসার নরক যন্ত্রণা ভোগ করে অবশেষে আইপিএস থেকে পদত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়ে এবার লোকসভায় বীরভূম আসনে প্রার্থী হলেন। সেজন্য নির্বাচনের সময় মমতা ব্যানার্জির কথা না শুনলে তার কী পরিণতি হতে পারে তার উজ্জ্বল উদাহরণ দেবাশিস ধর। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের কজন অফিসারের বুকের পাটা আছে যে মুখ্যমন্ত্রীর অনৈতিক নির্দেশ না মেনে নির্বাচন কমিশনের হয়ে নিরপেক্ষভাবে কাজ করবেন। সেজন্য বিগত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে পশ্চিমবঙ্গবাসী কোনোমতেই নির্বাচন কমিশনের এই ফাঁপা বিবৃতি, বজ্রআঁটুনি ফসকা গেরো মার্কা ব্যবস্থার উপর ভরসা রাখতে পারছেন না। তাই আবারও বলতে হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন জেগে আছেন তো? □

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা দুর্নীতির উৎস কোথায়?

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বীজ রোপিত হয়েছিল ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে কংগ্রেসের শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে। এরপর শিক্ষাক্ষেত্রে অনিলায়ন। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দু'হাত ভরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ করেছিলেন। সেই বিশ্বাসের অমর্যাদা কি তারা ফের করল না?

রানার চট্টরাজ

দুর্নীতি সমাজে কমবেশি চিরকালই রয়েছে। শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা বিশ্বে। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' পুস্তকে 'উৎকোচ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই বলে এত ব্যাপক দুর্নীতি! যেখানে হাত দেওয়া যাচ্ছে, সেখানেই শত শত কোটি টাকার গল্প। মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ না করলে প্রায় কিছুই জানা যেত না, যদিও কিছু জনশ্রুতি ছিল, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে। দুর্নীতির ঘটনা প্রথম প্রকাশ্যে এল শিক্ষাক্ষেত্রে। তারপর অন্যান্য ক্ষেত্রে। শিক্ষা মর্মস্পর্শী বিষয়। শিক্ষায় দুর্নীতি ও অব্যবস্থার উৎস খুঁজতে গেলে ফিরে তাকাতে হবে ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে। তখন পশ্চিমবঙ্গ-সহ প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ কংগ্রেস শাসনাধীন। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে বলতে পারি, কংগ্রেস কখনও শিক্ষা ও শিক্ষকদের নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

রাজনৈতিক দলে শিক্ষকদের যে ভূমিকা রয়েছে, দলের মতাদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, সেটা কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিলেন অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, ড. প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র, অজয় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই উন্নতমানের ব্যক্তি ছিলেন। অতুল্যবাবুর বিশ্বাস ছিল, শিক্ষক ও ছাত্ররা রাজনীতির বাইরে থাকবেন। শিক্ষক-অধ্যাপকদের একমাত্র কাজ হলো শিক্ষকতা করা, অধ্যাপনা-গবেষণা করা। বিদ্যার্থীদের কাজ পঠনপাঠনে মনোনিবেশ করা। আদর্শ ধারণা। কিন্তু বিপরীত দিকে কী হলো? কমিউনিস্ট পার্টি এর সুযোগ নিল। মার্কসবাদ প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষকদের ব্যবহার করা হলো। দল ও সংগঠনে তাঁদের লোভনীয় আসন দেওয়া হলো। বিধানসভা, বিধান পরিষদ, লোকসভা প্রভৃতি নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়া হলো। ছাত্রদের মধ্যেও সংগঠন পাকাপোক্ত করা হলো। ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে কংগ্রেসের কোনো প্রভাবই ছিল না। কোনো কোনো শিক্ষক বা ছাত্র কংগ্রেসের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে হয়তো যুক্ত ছিলেন। অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলো ১৯৬৭-তে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর অন্যান্য রাজ্যের মতো

এই রাজ্যে কংগ্রেসের পরাজয়ের পর ছাত্র-যুবফ্রন্টে সংগঠন তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হলো এবং অল্প দিনের মধ্যে কংগ্রেস ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই ও নকশালদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাত হলো।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদের সঙ্গে সঙ্গে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদেরও সংগঠন মজবুত হতে থাকে, যেটা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কারণে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু শিক্ষক ফ্রন্টে কংগ্রেস ব্যর্থ হলো। ১৯৭২-এ সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রদেশ কংগ্রেসের শিক্ষা সেল প্রথমবারের জন্য তৈরি হলো। বিদ্যালয় স্তরে কিছুটা সংগঠন তৈরি হলেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সাফল্য এল না। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষা সেলকে কোনো গুরুত্ব দিতেন না। এর সঙ্গে আরও একটি ঘটনা ঘটল। বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামের প্রেক্ষিতে ভারতের সঙ্গে অধুনা বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের কুড়ি বছরের মৈত্রী চুক্তি হলো। ১৯৭১-এর লোকসভা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস-সিপিআই নির্বাচনী বোঝাপড়া হলো। সিপিআই মার্কা বুদ্ধিজীবীরা পরিস্থিতির পুরো সুযোগ গ্রহণ করলেন। পশ্চিমবঙ্গ সমেত সমস্ত ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা এই বুদ্ধিজীবীরা নিয়ন্ত্রণ করতেন। কংগ্রেসিদের কোনো ভূমিকা ছিল না। দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় এই জিনিস চলেছিল। অটলবিহারী বাজপেয়ীর ছয় বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বকালেও অবস্থার বিশেষ হেরফের হয়নি। অবশ্য উল্লেখ করা উচিত, এই শতকের প্রথম দিকে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির নির্বাচনী বোঝাপড়ার সময় রাষ্ট্রবাদী শিক্ষক অজিত বিশ্বাসের নেতৃত্বে 'জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক মঞ্চ'-এর (এবিআরএসএম) উদ্যোগে অধ্যাপকদের সংগঠিত করার কিছুটা চেষ্টা শুরু হয়।

দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনে শিক্ষাক্ষেত্রে নগ্ন দলীয় রাজনীতি ও দুর্নীতি চরম সীমায় চলে গিয়েছিল। কিন্তু প্রায় কিছুই প্রকাশ্যে আসেনি, কারণ মার্কসবাদী লেলিনবাদী স্বৈরতান্ত্রিক সিপিএম দলটি সুসংগঠিত, কৌশলী ও সুচতুর এবং দলটির শিক্ষক সংগঠন অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। ২০১১-তে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর আশা করা গিয়েছিল, শিক্ষাক্ষেত্রে বামফ্রন্টের তথা সিপিএমের কুকর্ম নিয়ে তদন্ত হবে। যেই ধরনের দাবি উঠেছিল তার কিছুই হলো না। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংস্কৃতি একই। শিক্ষার গুরুত্ব নেই। তবে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ২০১৩ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের অধ্যাপক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলো— ওয়েবকুপা (West Bengal College & University Professors' Association)। সংস্থাটির কোনো সংগঠিত রূপ নেই। যে সমস্ত অধ্যাপক সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা বামফ্রন্ট শাসনে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন, তাঁদের অনেকেই ওয়েবকুপার শুধু সক্রিয় সদস্য নন, নেতৃত্বে চলে এলেন। পিছনে সিপিএমের মদত নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে এই সংগঠনের কোনো ভূমিকা ছিল না। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এদের কোনো গুরুত্ব দেননি।

এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কিছু আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত,সিপিএম-নকশাল ঘনিষ্ঠ তথাকথিত শিক্ষাবিদ শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে বসলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নকশালপন্থী অধ্যাপককে স্কুল সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান করা হলো। তাঁর তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয় স্তরে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে অনেক বিকৃত ও অরাষ্ট্রীয় তথ্য দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত শিক্ষা প্রশাসক আজকে জেলে আছেন, তারা কেউই কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেস অথবা ২০০৮ সালে গঠিত বামফ্রন্ট সরকার বিরোধী 'গণমুক্তি পরিষদ' নামাঙ্কিত বুদ্ধিজীবী মঞ্চ --- কোনোটারই সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। বরং তাঁরা বামফ্রন্ট সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট ছিলেন। এই সমস্ত অসৎ ও ধান্দাবাজ লোকরাই শিক্ষামন্ত্রীকে ঘিরে রেখেছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল, কারণ কংগ্রেসের মতো তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে শিক্ষার গুরুত্ব নেই, শিক্ষকদের মর্যাদা নেই এবং শিক্ষক সংগঠন মজবুত করার ক্ষেত্রে কোনো আগ্রহ নেই। বলুন তো, তৃণমূল কংগ্রেসের অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুপার কোনো প্রতিনিধি লোকসভা, বিধানসভা, এমনকী পুরসভার নির্বাচনে মনোনয়ন পেয়েছেন কি?

জেলে আছেন এমন এক মহারথী শিক্ষাবিদকে সিপিএমের দাক্ষিণ্যে সমস্ত নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করে দক্ষিণ কলকাতার একটি আইন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হলো। নিন্দুকরা বলেন, তিনি একই দিনে দুটি আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলএম এবং পিএইচডি উপাধি লাভ করেছিলেন। সত্য-মিথ্যা বলতে পারবো না। তাঁকে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি করা হলো তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হওয়ার পর। আর একজন মহারথী শিক্ষাবিদ প্রথমে সিপিএম নেতৃত্বের সাহায্যে ত্রিপুরার একটি সাধারণ কলেজ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটি কলেজের, তারপর দক্ষিণ কলকাতার একটি কলেজের অধ্যক্ষ হলেন। ২০১১-এর পর তাঁকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, পরবর্তীকালে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করা হলো। তিনি শিক্ষামন্ত্রী পার্থর দক্ষিণ হস্ত বলে পরিচিত ছিলেন।

যে কথা দিয়ে প্রবন্ধটি শুরু হয়েছিল, বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বীজ রোপিত হয়েছিল ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে কংগ্রেসের শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে। এরপর শিক্ষাক্ষেত্রে অনিলায়ন। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দু'হাত ভরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ করেছিলেন। সেই বিশ্বাসের অমর্যাদা কি তারা ফের করল না? □

With Best Compliments from-

A

Well Wisher

জনপ্রিয়তায় নরেন্দ্র মোদী বিশ্বে প্রথম

আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্সের মতো দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের চেয়ে বিশ্বজনীন জনপ্রিয়তায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অনেকটাই এগিয়ে। বিদেশি সমীক্ষক সংস্থা মর্নিং কনসাল্ট চলতি বছরে আন্তর্জাতিক স্তরে এক সমীক্ষা চালিয়েছিল জনপ্রিয়তা নিয়ে। তাতে ৭৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে নরেন্দ্র মোদী হয়েছেন প্রথম। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজ ম্যানুয়েল লোপেজ ৬৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় এবং ৫৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে তৃতীয় হয়েছেন সুইজারল্যান্ডের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট অ্যালেন বার্সেট। তারপর অন্য দেশগুলির নেতারা পর্যায়ক্রমে রয়েছেন।

ভুটান এই প্রথম বিদেশের কোনো রাষ্ট্রনেতাকে সর্বোচ্চ সম্মান দিল। সেই রাষ্ট্রনেতা হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর প্রাপ্ত সেই সর্বোচ্চ সম্মান হলো— 'অর্ডার অব দ্য ড্রুক গ্যালপো'। শুধু ভুটান নয়, বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক সম্মান তিনি পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতে জি-২০ গোষ্ঠীর সম্মেলন সফল হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে ভারত দ্রুত উন্নত অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠছে।

উল্লেখ্য, তাঁর দর্শন 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'। সম্প্রতি বিশ্ব যখন করোনা সংক্রমণে ম্রিয়মাণ, তখন মোদীজী দক্ষতার সঙ্গে সেই সংকট মোকাবিলা করেছেন। সে সময় ভারত প্রায় ১০০টি দেশে ওষুধ, ২০ কোটি ভ্যাক্সিনের ডোজ পাঠিয়েছিল। ইউক্রেন যুদ্ধের সময় ২২,৫০০ জন ভারতীয়কে দেশে ফিরিয়ে আনা, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশীয় অস্ত্র তৈরি এবং বিদেশে অস্ত্র রপ্তানি করার কৃতিত্ব অর্জন ছাড়াও সিএএ ইত্যাদি রাজনৈতিক সমাধানও মোদীজীর নেতৃত্বে সুশাসনের বিশেষ সাফল্য। কারণ ভারত ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছিল। স্বাধীনতার পর এক দেশ, এক বিধান, এক প্রধান, এক নিশান ছিল না। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের মাধ্যমে তা সম্ভব হয়েছে, ভারতে নারীর মর্যাদা রক্ষায় তিন তালাক বাতিল— এ সবই মোদীজীর কৃতিত্ব। ভারতের সফল চন্দ্রাভিযান এবং ইউনেস্কোর তরফে দুর্গাপূজাকে হেরিটেজ ঘোষণা সব কিছুই মোদীজীর নেতৃত্বে সম্ভব হয়েছে। গাজায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণার ক্ষেত্রে জর্ডনের প্রস্তাবে ভারত-সহ ৪৫টি দেশ ভোট দানে বিরত বা জোট নিরপেক্ষ ছিল এটা মোদীজীর নেতৃত্বে ভারত সরকারের বিদেশনীতির সাফল্য, কারণ জোট নিরপেক্ষতা ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির কৌশল। এ বাস্তব চিত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর যোগ্যতার প্রতিফলন। তাই তিনি বিশ্বনেতাদের মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী হয়েছেন, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,**
সাহেবের হাট, রাশিডাঙ্গা-২,
কোচবিহার।

বোরো চাষ কমিয়ে গম, সরিষা ও তিল চাষ হোক

বোরো ধান চাষের জন্য প্রচুর পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলিত হয়। এতে ভৌমজলের স্তর ধ্বংস হয়ে ভূমির অভ্যন্তরের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এর ফলে মাটির নীচে খালি হয়ে গিয়ে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। বোরোধান কাটার পর ধানগাছের গোড়ার অবশিষ্টাংশ মাটিতে থেকে যাওয়ার ফলে কৃষকরা তা নষ্ট করার জন্য তাতে অগ্নিসংযোগ করে থাকেন। তার ফলে ধোঁয়া সৃষ্টির জন্য আমের মুকুল নষ্ট হয়। শীতকালে ধানজমিতে জল থাকার দরুন মশা বাড়ে। খরচের তুলনায় লাভ বিশেষ হয় না। বরং অনেক কম জলে গম, সরিষা ও তিল চাষ করা যায়। এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

— **সুশান্ত কুমার দে,**
ক্ষিরিন্দা, কৃষ্ণপ্রিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর।

কাচনা বৃক্ষকেও জাতীয় বৃক্ষের মর্যাদা দেওয়া হোক

বহু প্রতীক্ষার পর অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রভু রামলালার মন্দির। দীর্ঘ পাঁচশো অপেক্ষার পর এবছর স্বয়ং রামলালা হোলি খেললেন ভক্তদের সঙ্গে। যা আমাদের পরমপ্রাপ্তি। কাচনা ফুলের আবিরে রঞ্জিত হলেন প্রভু রামলালা।

আমরা জানি রামরাজ্যে কাচনা বৃক্ষ রাজবৃক্ষের মর্যাদা পেত। অযোধ্যায় নবনির্মিত ভব্য মন্দিরে স্বয়ং রামলালার প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে এদেশে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির কাছে অনুরোধ যে কাচনা বৃক্ষকে জাতীয় বৃক্ষের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। আশা রাখি দেশের কোটি কোটি হিন্দুদের আবেগকে মর্যাদা দিয়ে রাষ্ট্রপতি আন্তরিকতার সঙ্গে রামরাজ্যের রাজবৃক্ষ কাচনা বৃক্ষকেও জাতীয় বৃক্ষের মর্যাদা দেওয়ার জন্য আন্তরিক উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

কুন্তল চক্রবর্তী,
কলেজ রোড, খয়রামারী, বনগাঁ,
উত্তর ২৪ পরগনা।

ঈশ্বর-আল্লা তেরো নাম, সবকো সন্মতি দে ভগবান

বিদ্রোহী কবিতায় কাজী নজরুল গেয়েছেন, 'আমি ভগবানের বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন'। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় নজরুলকে 'কাফের' সম্বোধন করা হয়েছিল। নজরুলের জন্ম মুসলিম পরিবারে, তিনি ছিলেন একজন মানুষ। ভারতবর্ষ চিরকালই উদার মনোভাবাপন্ন ছিল, তাই তিনি 'ভগবানের' পরিবর্তে 'আল্লা' শব্দটি ব্যবহার করেননি। এতে হিন্দুর বা ভগবানের কিচ্ছু

ফঃ ৩

আসে-যায়নি। কেউ এজন্যে নজরুলকে গালমন্দ করেননি। আমিও করছি না। নজরুল নমস্য, নজরুল দৃষ্টান্ত মাত্র। আমার প্রসঙ্গ ভিন্ন। কবি ও সাহিত্যিকরা একটু উদার হন। কেউ কেউ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হন। তাতে ক্ষতি নেই। মুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া কবি-সাহিত্যিকরা যাদের ঈশ্বর তত্ত্বে সংশয় আছে, বা সৃষ্টিকর্তাকে গালি দিতে চান, তাঁরা কিন্তু আল্লাকে নন, ঈশ্বর বা ভগবানকে গালি দেন। আমি এর সঠিক কারণ বুঝতে অপারগ। এটি কি শুধুমাত্র শব্দ চয়ন? ঈশ্বর শব্দটি শ্রুতিমধুর, আপন, সুন্দর, ছন্দময় এটিই কি কারণ? নাকি নেতিবাচক অর্থে 'আল্লা' শব্দটি ব্যবহারে ভীতি? সেক্যুলার হিন্দুরা তাঁদের ঈশ্বরকে গালি দেবেন সেটাই স্বাভাবিক। মুসলমানরা আল্লা শব্দটি ব্যবহার করেন না বরং তাঁরা ঈশ্বরকে গালি দিতে পছন্দ করেন? কারণ কী?

ঈশ্বর শব্দটি স্নিগ্ধ। গালি দিলেও তিনি বা তাঁর ভক্তরা কিছু বলেন না, এটি কি কারণ? এটা সত্য যে, ঈশ্বর শব্দটি বাংলায় বহুল প্রচারিত ও ব্যবহৃত। আল্লা শব্দের ব্যবহার মুসলিমদের মধ্যে সীমিত। এক্ষেত্রে আমি ধর্ম নিয়ে কথা বলছি না। ঈশ্বর ও আল্লা— এ দুটি শব্দের বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে ব্যবহার নিয়ে বলছি। আমার জানার ইচ্ছে, মুসলিম লেখকরা নেতিবাচক অর্থে আল্লার পরিবর্তে ঈশ্বর শব্দটি ব্যবহার করেন ভয় থেকে নাকি শব্দ চয়নের জন্যে? নাকি ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা থেকে?

—**শিতাংশু গুহ,**
নিউইয়র্ক।

কোনটা কাশ্মীর, কোনটা বঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ কি কাশ্মীর হতে পারে? অনেকেই বলবেন যে ভালোই তো আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ভূস্বর্গে পরিণত হলে তো ভালোই হয়। হ্যাঁ ঠিকই, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ভূস্বর্গেই পরিণত হচ্ছে, তবে সেটা দুষ্কৃতীদের। কতটা এদের সাহস যে বিস্ফোরণ ঘটল ব্যাঙ্গালোরে, আর জঙ্গি ধরা পড়ছে ২০০০ কিলোমিটার দূরে পশ্চিমবঙ্গে।

যে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান কথায় কথায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে পেটানোর নিদান দেন, সেই রাজ্যে এই অবস্থাটাই কি স্বাভাবিক নয়? মধ্যরাতে বিকট আওয়াজে কেঁপে ওঠে গোটা গ্রাম, ৩টি প্রাণ হয় ছিন্নভিন্ন। এটা কি খুব বড়ো ঘটনা মনে হয়? লোকে যেন ভাবে, ধুর! এটা একটা ছোটো ঘটনা, সামান্য চকোলেট বোম ফেটেছিল বলছেন রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী। এর পরে কার ঘাড়ে কটা মাথা যে তার তদন্ত করবে? চাকরি করতে হবে তো, নাহলে তো আবার প্রাক্তন আইপিএস দেবাশিস ধরের উদাহরণ আছেই চোখের সামনে।

মনে আছে বগটুইতে ১২ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল? মনে আছে সেই জ্বলন্ত মানুষগুলির মধ্যে ২ জন ছোট্ট শিশুও ছিল। আগুনের খবর পেয়েও পুলিশ আসেনি, কারণ শাসক দলের নেতারা পুলিশ পাঠায়নি, বা পুলিশকে আসতে দেয়নি। বিধানসভা, পঞ্চায়েত ভোট পরবর্তী হিংসাতে কত লোকের প্রাণ গেছে, কত মানুষের ইজ্জত চলে গেছে, কত মানুষ আজও ঘর ছাড়া। সব ছোটো ঘটনা— সব বিরোধীদের চক্রান্ত।

রাত ১২টার পর পিঠে বানাতে ডাকা, ভাঁওতা দিয়ে চাষের জমি লুট, বিরোধিতা করলে লাশটা পর্যন্ত গায়েব করে দেওয়া, মাছ ব্যাপারির ২০০ কোটি, পঞ্চায়েত প্রধানের মোপেড থেকে স্করপিয়ো গাড়ি, দু'তলা মোজাইক বাড়ি। চাকরি চাইতে গেলে পুলিশের লাথি আর জেলের ভাত। আহা! এসব তো উন্নয়নের অংশ! বিরোধীরা যা বলে সব মিথ্যে, আদালত সে তো বিকিয়ে গিয়েছে, তিনিই তো সত্য, কেন মনে নেই 'তিনি সততার প্রতীক'!

৩৭০ তুলে নেওয়ার পর কাশ্মীরের পর্যটক সংখ্যাই প্রমাণ দেয় শান্তি ফিরে আসার। প্রসঙ্গটি মাথাতে আসে এক সংবাদমাধ্যমের বিতর্ক সভাতে এক প্রাক্তন সেনাকর্তার কথা শুনে। তিনি এমন অনেক রাজ্যে কাজ করেছেন যেখানে ঠিক এমনই অবস্থা ছিল। জেহাদি কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেলে এবং ক্রমশ লাগামছাড়া হলে প্রথমে আফস্পা আইন লাগু হয়, তারপর সিআপরিএফ আসে এমনটাই তাঁর বক্তব্য।

কী মনে হয় বর্তমানে কোনটা কাশ্মীর আর কোনটা পশ্চিমবঙ্গ? উত্তরটা নিজেকেই নিজে দিন, এবং ভাবুন, ভাবা অভ্যাস করুন।

— **অরিজিৎ ঘোষ,**
বারুইপুর।

রাষ্ট্রীয় সম্পদের হিসেব যোগ করতে হবে

গত ২১ মার্চ এক দৈনিক সংবাদপত্রে 'মোদী আমলেই দেশে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য সর্বাধিক, মাত্র ১ শতাংশের হাতে দেশের ৪০ শতাংশ সম্পদ' সংবাদ পড়ে একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে এই পত্রের অবতারণা। প্রথমত, দেশের সম্পদ বলতে আমরা কী বুঝব? কেবল ধনী আর সাধারণ মানুষের সম্পদের যোগফল? তাহলে দেশের বাকি সম্পদ কোথায় গেল? যেমন রেলওয়ে, রাস্তাঘাট, সরকারি কার্যালয়, স্কুল-কলেজ, সরকারি জমি, বনজঙ্গল, নদ-নদী, খনিসমূহ, ঐতিহাসিক ইমরাত ইত্যাদি যা মনে করে লেখা সম্ভব হচ্ছে না। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় সম্পদের ১ শতাংশের মালিকানা হচ্ছে ধনীদের আর অবশিষ্ট ৯৯ শতাংশের মালিকানা হচ্ছে গরিব বা সাধারণ মানুষের। এরূপ রাষ্ট্রীয় সম্পদ গরিবের সঙ্গে যোগ করলে ধনী-অধনী বৈষম্য অনেক কমে যাবে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ হচ্ছে সাধারণ মানুষের চালিকাশক্তি। এছাড়া বর্তমানে শ্রমের মর্যাদা ও আর্থিক মূল্য বেড়ে গেছে। আরও বাড়বে। তাছাড়া রয়েছে সরকারি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, গবেষণায় যা দেখানো হয়েছে তা কি যুক্তি বা অর্থনীতিসম্মত?

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ।

With Best Compliments from-

A
Well Wisher

মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে মায়েদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

নিবেদিতা কর

চিকিৎসকদের মতে, মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল ছেলেদের চাইতে কিছুটা আগে শুরু হয়। মূলত ১০ থেকে ১৩ বছরের মধ্যে যে কোনো সময় তা হতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরীদের মধ্যে যা যা শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা হলো : মেয়েদের উচ্চতা বাড়ে ও শরীরের বিকাশ হয়। বয়ঃসন্ধির সময় উচ্চ মাত্রায় বৃদ্ধি হয়। বয়ঃসন্ধির ছেলে-মেয়েরা ভীষণ কৌতূহলপ্রবণ হওয়ায় অনেক সময় তাদের বিপথগামী হওয়ার, মাদকের নেশায় জড়িয়ে পড়া, অযাচিত ঝুঁকি নেওয়া বা অপসংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। সেক্ষেত্রে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে সচেতন ভূমিকা রাখতে হবে। আবার এই বয়সটায় স্বাধীন আত্মপরিচয় গড়ে ওঠায় তারা সব কিছু নিয়ে ভীষণ সংবেদনশীল থাকে। তাই তাদের সঠিক পথে রাখতে মাকে কৌশলী ভূমিকা রাখতে হবে। এই বয়সটাতে ছেলে-মেয়েরা বাবা-মায়ের চাইতে বন্ধু-বান্ধবদের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। অনেকেই বাবা মায়ের কথা মেনে নিতে পারে না, রেগে যায়। মস্তিষ্ক তখনও যথেষ্ট বিকশিত হয় না এবং ক্ষোভ বিষণ্ণতা, উদ্বেগ, আত্মহত্যার চিন্তাভাবনা প্রভৃতি ধ্বংসের অনুভূতি সৃষ্টিকারী হরমোনগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো মানসিক পরিপক্বতা সবার মধ্যে থাকে না। এই সময়ে কিশোরীরা ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠা, দুর্গন্ধযুক্ত, প্রচুর ব্রণ, অকারণে মেজাজ হারানো, অহেতুক বিরক্ত হয়ে ওঠা, এমনকী এক বা দুই বছরের জন্য সবাইকে ঘৃণা করতে থাকা, ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সময় কিশোরীরা সম্ভবত পুরো ক্লাসকে তার বন্ধু বলা বন্ধ করবে এবং তার নতুন ক্রাশ শুরু হয়। আবার সে বাথরুমে বেশি সময় কাটাতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালে যেহেতু ছেলে মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতার বিকাশ হয় তাই এই বয়সে সেক্স এডুকেশন বা যৌনশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি যেখানে তার এই শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের দিকগুলোর বিষয়ে ব্যাখ্যা থাকবে। এতে তারা ঘাবড়ে যাবে না।

প্রজনন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মানসিক ও সামাজিক বিষয়ে তাদের কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে। ছেলে-মেয়েরা একে অপরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, সেটা তারা কীভাবে হ্যান্ডেল করবে সে বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি একটা দিক নির্দেশনা দিতে পারে। কারও সঙ্গে রোমান্টিক সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে তার পরিসীমা মেনে চলা, আরেকজনের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সম্মান জানানো, একে অপরের প্রতি সৎ থাকা, এসব বিষয়ে তাদের সচেতন করা দরকার। বয়ঃসন্ধিকালীন সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া এবং প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগ সম্পর্কে জানা ও প্রতিরোধ করার জ্ঞান থাকা জরুরি। এই সময় প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, কার্বোহাইড্রেট, জিংক, আয়োডিন, আয়রণ সমৃদ্ধ খাবার যেমন, শাসকসবজি, ফলমূল, ডাল, ডিম, দুধ, মাছ, মাংস খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদরা। সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত খেলাধুলা ও ব্যায়ামের প্রতি জোর দেওয়ার কথাও জানান তারা।

এই বয়সটাতে ছেলে-মেয়েরা বাবা মায়ের চাইতে বন্ধু-বান্ধবদের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। এ বিষয়গুলি বাবা-মায়ের পক্ষে মেনে নেওয়াও কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু তাদের ধৈর্য হারালে চলবে না। তাদের আচার আচরণকে সম্মান করতে হবে। এক্ষেত্রে সন্তানের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বা কোনোভাবেই তাদের গায়ে হাত তোলা যাবে না। এছাড়া তুলনা করা, ছোটো করে কথা বলা যাবে না তার মানে এই নয় যে তারা যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে। বরং সন্তানের পছন্দ, অপছন্দের প্রতি সম্মান জানিয়ে সেটা বুঝিয়ে বলতে হবে। যেন তার আত্মসম্মানে আঘাত না লাগে আবার ভালো-মন্দের ব্যবধানটাও তাদের বোঝানো যায়। এই বয়সে ছেলে-মেয়েদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত। বাচ্চাদের একটু একটু করে ছাড়তে হবে। শিশুদের মতো নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। তার ব্যাগ চেক করা, মোবাইল চেক করা, ডায়েরি খুলে পড়া এসব করা যাবে না। বন্ধু-বান্ধবের ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করা যাবে না। তবে তারা কী করছে, কাদের সঙ্গে মিশছে সেটা অন্যভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। না হলে তারা বাবা-মায়ের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার জায়গাটা হারিয়ে ফেলবে।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরীরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয় তার বেশিরভাগটাই সমাধান করা যায় বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে। এছাড়াও এই সময়ের বিভিন্ন সমস্যাগুলোর সমাধানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরিবারের বিশেষ করে বাবা-মায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এবং সেটিও পেরেন্ট-টিচার মিটিঙের মাধ্যমে পিতা-মাতাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়িয়ে অর্থাৎ পেরেন্টদের কাউন্সেলিঙের মাধ্যমে করা যেতে পারে। □

শিশুর সঠিক পরিচর্যা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

পৃথিবীর আলো-বাতাস নবজাতক শিশুর জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটি পরিবেশ। খাওয়াদাওয়া ও ঘুম-সহ সবকিছুই তার কাছে নতুন। তাই মায়ের গর্ভে নীরবে, নিশ্চিন্তে থাকা নবজাতক শিশুর পৃথিবীর আলো-বাতাসে খাপ খাইয়ে নিতে কষ্ট হয়। আর তাই এ সময় নবজাতক শিশুকে নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে এবং সুস্থ-সবল রাখতে প্রয়োজন বিশেষ যত্ন আর পরিচর্যা।

খাওয়া : মনে রাখা প্রয়োজন, মায়ের বুকের দুধই হচ্ছে শিশুর প্রথম ও প্রধান টিকা। মায়ের দুধ শিশুর পুষ্টি বাড়ায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আর তাই ০-৬ মাস পর্যন্ত শিশুকে ১ ঘণ্টা পরপর শুধুই মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। এ সময়ের মধ্যে মায়ের বুকের দুধ ছাড়া শিশুকে কিছুই খাওয়ানো যাবে না। এমনকী এ সময়ের মধ্যে শিশুকে জল খাওয়ানোরও প্রয়োজন নেই। তবে ৬ মাস বয়সের পর থেকে পুষ্টির জন্য শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি উপযুক্ত বাড়তি খাবার দিতে হবে।

স্নান : নবজাতক শিশুর ক্ষেত্রে জন্মের দুই থেকে তিন দিন পর স্নান করাতে হবে। এ সময় হালকা কুসুম গরম জল দিয়ে স্নান করাতে হবে। স্নানে না করালে চামড়া খসখসে হয়ে ছত্রাক সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। স্নানের পর কানে যেন জল না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। স্নানে প্রতিদিন সাবান ব্যবহার না করে ৩-৪ দিন পরপর লিকুইড সোপ ব্যবহার করুন। স্নানের পর নবজাতকের গা গরম সুতি পাতলা কাপড় কিংবা টাওয়েল দিয়ে খুব আস্তে আস্তে মুছে দিন। হাতে-পায়ের ভাঁজে যেন জল লেগে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। স্নানের পর হালকা করে অলিভ অয়েল ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিছানা, পোশাক-পরিচ্ছদ : শিশুকে বেবি ক্যারিয়ার, দোলনা বা বিছানা যে জায়গাতেই রাখুন না কেন তা আরামদায়ক হওয়া উচিত। তবে শিশুর বিছানা খুব নরম হওয়া উচিত নয়। মা যে ধরনের বিছানায় অভ্যস্ত তাতেই শিশুকে রাখা উচিত। শিশুকে শোয়ানোর পর শিশুর চারদিকে পাশবালিশ আর মাথার নীচে বালিশ না দিয়ে পরিষ্কার সুতি কাপড় গোল করে দিন। এতে শিশুর মাথার আকৃতি সুন্দর হবে। আর শোয়ানোর পর অবশ্যই মশারি খাটিয়ে দিন।

নতুন শিশুটিকে নতুন-পুরনো যেই পোশাকই পরান না কেন, পরানোর আগে তা অবশ্যই পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে। শিশুর পোশাক, কাঁথা, কাপড় নিয়মিত সাবান, স্যাভলন দিয়ে ধুতে হবে। এতে জীবাণু থাকার সম্ভাবনা থাকবে না। আর নবজাতকের পোশাক অবশ্যই নরম সুতি কাপড়ের হতে হবে। নবজাতককে সব সময় কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবেন না।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা : নবজাতককে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। আর শুধু নবজাতককেই নয়, এ সময় মাকেও সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। মায়ের নখ ছোটো ও পরিষ্কার রাখতে হবে। পরিষ্কার হাতে শিশুকে খাওয়াতে ও ধরতে হবে।

টিকা : একটি টিকা এ আর এমনকী, এমন ধারণা অনেক মায়েরই থাকে। কিন্তু প্রত্যেক মায়েরই মনে রাখা দরকার, এই টিকাগুলোই নবজাতকের জীবন বাঁচাতে জরুরি। শিশু জন্মের ১ বছরের মধ্যে সাতটি রোগের টিকা নিতে হবে। জন্মের ৬ সপ্তাহের মধ্যে দিতে হবে বিসিজি টিকা। এরপর দেড় মাস ও আড়াই মাস বয়সে পরবর্তী টিকা দিতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে ১ বছরের মধ্যে সাতটি টিকা দিতে হবে।

নাক, কান ও চোখের যত্ন : শিশুদের নাক, কান পরিষ্কার করতে কটনবাড ব্যবহার করা উচিত নয়। নরম পাতলা সুতি কাপড় জলে ভিজিয়ে জল ঝরিয়ে চোখ পরিষ্কার করুন। স্নানের পর কান ভালো করে মুছে দিন।

সাবধানতা :

- ডায়রিয়া হলে নবজাতককে বেশি করে মায়ের দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করুন। স্যালাইন খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই।
- নবজাতক ঘেমে গেলে পাতলা শুকনো সুতি কাপড় দিয়ে ঘাম মুছে দিন।
- শিশুদের ঘন ঘন চুল ছাঁটলে চুল ঘন হয়— এ ধারণা ঠিক নয়।
- শিশুদের ত্বকে কোনো ধরনের কসমেটিকস, তেল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- নবজাতককে সুস্থ রাখতে হলে শুধু নবজাতকই নয়, মায়েরও সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা জরুরি।
- ০-২ মাস বয়সি শিশু প্রতি মিনিটে ৬০ বার বা তার বেশি শ্বাস নেয়, ২-১২ মাস বয়সি শিশু ৫০ বার বা তার বেশি শ্বাস নেওয়া স্বাভাবিক।
- নবজাতকের সামনে হাঁচি, কাশি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। তা না হলে শিশু সহজেই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।
- এ সময় শিশুকে খুব ভারী কাপড় পরানো উচিত নয়। □

বাল্মীকির রামায়ণ লোককল্যাণে রচিত হনুমানের রামায়ণ ভক্তিরসে জারিত

দুর্গাপদ ঘোষ

রাম ও রামায়ণ নিয়ে ভারতবর্ষ তো বটেই সারা বিশ্বে কৌতূহল এবং জ্ঞান-গবেষণার অন্ত নেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরে স্থাপিত রামলালার বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় বলেছেন 'রাম কেবল ভক্তি নয়, রাম প্রেরণার উৎস। রাম আগুন নয়; রাম শক্তির উৎস।' মানব-সন্তান থেকে দেবত্বে উন্নীত এই মর্যাদা পুরুষোত্তমের প্রেরণা এবং শক্তির মূর্ত উদাহরণ লক্ষ্য করা যায় পরম রামভক্ত অঞ্জনা-পুত্র মহাবীর হনুমানের মধ্যে। রামচন্দ্র কেবল মহাবিষ্ণুর সপ্তম অবতার নন। তিনি জ্ঞান, শক্তি, সাম্য, ত্যাগ, ভক্তি ও ধর্মের সম্মিলিত আদর্শের সনাতন বিগ্রহ। প্রভুভক্ত হনুমানও যে জ্ঞান, শক্তি, ত্যাগ, ভক্তি ও সেবার মূর্ত বিগ্রহ তাঁর প্রতি রামচন্দ্রের নিঃসীম আস্থাতেই তা প্রমাণিত। রাজ্যপাট, সংসারধর্ম থেকে নির্বাণ লাভকারী শ্রীরামচন্দ্র সরযূ নদীতে সলিলসমাধি নিয়ে ইহলীলা সাঙ্গ করার আগে তাঁর পার্থিব সমস্ত কিছু সুযোগ্য তিন ভাই এবং দুই পুত্রের হাতে অর্পণ করার পরও হনুমানের কাছে ভক্তাধীন ভগবান হয়ে

অযোধ্যাকে রক্ষা করার জন্য, অযোধ্যার সমস্ত সংকটমোচনের দায়িত্ব প্রদান করেন তাঁর পরম আস্থাভাজন হনুমানের ওপর। সেই সূত্রে তিরুমালা পার্বত্য অঞ্চলের অঞ্জনাদ্রির পবনপুত্র অনন্তকালের জন্য অযোধ্যার রক্ষক। তাই অযোধ্যা যেমন রামের রাজ্য— রামরাজ্য, অযোধ্যা তেমনি হনুমানেরও গড়— হনুমানগঢ়ী। রামকে বাদ দিয়ে যেমন মানবতার কথা কল্পনা করা যায় না, তেমনি প্রশ্নহীন সেবক হনুমানকে বাদ দিয়ে রামচন্দ্রের জীবনালেখ্য রচনার কথা ভাবা যায় না। গোস্বামী তুলসীদাস এজন্যই তাঁর অমর রচনা রামচরিতমানস এবং ৪০টি দোহায় হনুমানের গুণগান করেছেন যা 'হনুমান চালিশা' নামে সর্ববিদিত, বন্দিত ও গীত হচ্ছে। তাই বর্তমানে দক্ষিণ ভারতের হাম্পি অঞ্চলে জন্মলাভ করা বনবাসী নর বা বানর জনজাতির মাথার মণি তথা অযোধ্যা রক্ষার কাণ্ডারি হনুমানের মুখোমুখি হয়ে তবেই পুনর্নির্মিত রামজন্মভূমি মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করা যায়।

> **বিশ্বের অন্তত ৫০-৬০টি দেশে লক্ষাধিক মন্দিরে প্রতি বছর রামনবমীতে যেমন শ্রীরামচন্দ্রের পূজার্চনা হয়ে থাকে, তেমনি বহু দেশে অসংখ্য হনুমান মন্দিরে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে হনুমানের জন্মতিথি— হনুমান জয়ন্তী।**

শ্রীরাম নামের মহিমা সেই ত্রেতাযুগে দেবর্ষি নারদের মুখে শুনেছিলেন রামায়ণ অর্থাৎ রামের অয়ন বা রামচন্দ্রের জীবনযাত্রার রচয়িতা আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি। আদি বার্তাকার বা আদি সাংবাদিক দেবর্ষির সেই বর্ণনা ঐতিহাসিক মহাকাব্য রামায়ণের মধ্যে বিধৃত হওয়ার পর থেকে এখনও অবধি রাম মহিমা সমগ্র মানব সমাজকে এক অদৃশ্য চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে চলেছে। পৃথিবীর বুকে মানবরূপী ঈশ্বরাবতার ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের ক্ষণসম্পর্কে

বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের প্রতি-গণনা বা ব্যাক ক্যালকুলেশন করে ইংরেজি ক্যালেন্ডারের হিসেবে তাঁর জন্মক্ষণের দিন-তারিখ এমনকী নিখুঁত সময় পর্যন্ত জানতে পেরেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এ বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে সেই দিনটা হলো ১৭ এপ্রিল এবং ক্ষণ হলো দুপুর ১২.৩০ মিনিট। জ্যোতির্বিজ্ঞানী পুষ্কর ভাটনাগরের তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ 'Dating the era of Ram'-এ স্পষ্টভাবেই জানানো হয়েছে যে ৫,১১৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ১০ জানুয়ারি বেলা ১২.৩০ মিনিটে সরযূ নদীর তীরে অযোধ্যায় রামচন্দ্রের জন্ম হয়। এই হিসেবে এ বছর রাম নবমীতে রামচন্দ্রের বয়স ৭ হাজার ১৩৮ বছর। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির Planetary Software-এও এর প্রমাণ মিলছে।

বাল্মীকি রামায়ণকে অনুসরণ করে বিশ্বে মুখ্যত ৬২ খানা রামায়ণ-সহ প্রায় ৩০০ রামায়ণ রচিত হয়েছে। যার মধ্যে অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, রামচরিতমানস, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, দক্ষিণ ভারতে পামবাণী রামায়ণ, থাইল্যান্ডে রামকিয়েন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসবই মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণের বহু হাজার বছর পরে রচিত কিংবা অনূদিত হয়েছে। কিন্তু বাল্মীকির সমসাময়িককালেও যে পরম ভক্তিরসে জারিত একখানা রামায়ণ রচিত হয়েছিল এবং সেই রামায়ণ যে রামভক্ত বীরহনুমান রচনা করেছিলেন একথা জানলে নিঃসন্দেহে বহু মানুষই অবাক হয়ে যাবেন। যেমন একথা জানলে অনেকেই অবাক হবেন যে বিশ্বের বৃহত্তম এবং অর্থমূল্যে সবচাইতে দামি রামায়ণ তৈরি হয়েছে অতি সম্প্রতি রামলালার বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে। তার সৃষ্টিকার মনোজ রতন শর্মা। তিনি প্রতিটি পৃষ্ঠা দামি কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো এই বৃহত্তম গ্রন্থটি উপহার দিয়েছেন শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টকে। এর বর্তমান আর্থিক মূল্য হলো ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। তবে এটা কোনো মৌলিক রচনা নয়, মূল রামায়ণেরই এক মনোজ্ঞ ও বিশালাকার সংস্করণ। তবে এ থেকে এটা বোঝা যায় যে প্রাণপ্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে কতরকম মানুষের রামভক্তির কতরকমের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা গেছে।

শ্রীহনুমানের রচিত রামায়ণ নিয়ে আলোচনায় আসার আগে জানিয়ে রাখি যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত রামজন্মভূমি মন্দির দর্শনের জন্য মানুষ অতি আকুল এবং প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষের ঢল নামছে। এ বছরের রামনবমীকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী এবং উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা নিয়ে সামান্য আলোচনা করাটাও মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গত ২২ জানুয়ারি প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরের দিনই প্রায় ৭ লক্ষ ভক্ত ও দর্শনার্থী রামজন্মভূমি মন্দির দর্শন করেন। সেই থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২ লক্ষের মতো ভক্ত সমাগম হচ্ছে। প্রশাসনিক কর্তারা মনে করছেন যে ১৭ এপ্রিল রামনবমীর দিন ফের ৭ লক্ষ ছাপিয়ে যেতে পারে। ফলে মূল যে ৪টি পথ দিয়ে এখন মন্দিরে যাওয়া-আসা চলছে তা অকুলান হয়ে প্রচণ্ড ভিড়ের চাপ সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্য ১৫ এপ্রিলের আগেই আরও অন্তত ৩টি করিডর বা প্রশস্ত পথ তৈরি করে চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। গত ৮ ফেব্রুয়ারি এজন্য মোট ৪৯ কোটি টাকা মঞ্জুরও করেছে। তখন ঠিক হয়েছে ১২ কোটি টাকা খরচ করে ২৯০ মিটার লম্বা 'সুগ্রীব পথ', ২০ কোটি টাকা খরচ করে ৪০০ মিটার 'ক্ষীরসাগর পথ' এবং ১৭ কোটি টাকা খরচ করে ৩০০ মিটার 'আওয়াধ আগমন পথ' তৈরি করা হবে। পথগুলো অযোধ্যাধাম রেল স্টেশন এবং জন্মভূমি মন্দিরে যাওয়ার প্রধান রাস্তা 'রামপথ'-এর সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এছাড়া প্রচণ্ড ভিড়ের সময় যাতে যানবাহনকে অন্য পথে (বাইপাস) ঘুরিয়ে দেওয়া যায় সেজন্য আলাদা করে আরও ১৭ কোটি টাকা খরচে কয়েকটা নতুন রাস্তাও তৈরি হচ্ছে। গত ১৪ মার্চ মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছেন যে রাম নবমীতে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টাই মন্দির খোলা থাকবে এবং রামলালাকে দর্শন করা যাবে।

শ্রীরামচন্দ্রের মহত্ত্ব ও সদ্গুণের কথা নতুন করে বলার কোনো অবকাশ নেই। মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে রামচন্দ্রের যে ১৬টি সদ্গুণের কথা জেনেছিলেন দেবর্ষি সেই সমস্ত গুণের কথা জানতে পেরেছিলেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছ থেকে। লোককল্যাণে রামায়ণের ছত্রে ছত্রে মহর্ষি তা বিধৃত করে গেছেন। রামায়ণের পাঠক, বাচক ও শ্রোতা মাত্রেই রামকথার সঙ্গে পরিচিত, সম্পৃক্ত ও একাত্ম। বাল্মীকির রামায়ণকে অনুসরণ করে আকণ্ঠ ভক্তিরসে জারিয়ে পরিবেশন করেছেন ভক্তকবি তুলসীদাস, কৃত্তিবাস ওঝা, মহর্ষি পামবান প্রমুখ। কিন্তু স্বয়ং দেবর্ষির কথা অনুযায়ী রামচন্দ্রকে নিয়ে যদি আরও বেশি ভক্তিরসাত্মক রামায়ণ কেউ রচনা করে থাকেন তবে তিনি হলেন প্রভুভক্ত হনুমান। নারদের কাছ থেকে রামচরিত শোনার পরে বাল্মীকি যখন তাঁর ঐতিহাসিক মহাকাব্য রচনা শেষ করলেন তখন তা হৃদয়ঙ্গম করে নারদ বাল্মীকিকে বললেন, এটা খুবই ভালো হয়েছে, তবে হনুমানেরটা আরও ভালো।

বাল্মীকি কালবিলম্ব না করে হনুমানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন এবং কদলী বনে গিয়ে পৌঁছলেন। কিন্তু কোথায় গ্রন্থ! তেমন কিছু তো নজরে আসছে না। কেবল একপাশে জমা হয়ে আছে খান সাতেক বড়ো বড়ো এবং অখণ্ড কলাপাতা। আর সেই পাতাগুলোর সামনে হাঁটু মুড়ে পরম ভক্তিতে হাতজোড় করে বসে আছেন এক মহা বলশালী ব্যক্তি— অঞ্জনাদ্রির আঞ্জনেয়। বাল্মীকি কলাপাতাগুলোকে উলটেপালটে দেখলেন তাতে রামভক্ত হনুমান তাঁর প্রভুর গুণবত্তা, করুণা ও অনুকম্পার কথা বিধৃত করে রেখেছেন। মহর্ষির উপস্থিতি টের পেয়ে তাঁকে প্রণাম করে যখন উঠে দাঁড়ালেন, দীর্ঘদেহী হনুমানের দু'চোখ বেয়ে তখন গড়িয়ে পড়ছে রামভক্তির বিগলিত ধারা। রামায়ণের সৃষ্টিকর্তা হনুমানের সৃষ্টি পাঠ করার পর তাঁরও দু'চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু নেমে আসতে লাগল। হনুমান তা দেখে মহর্ষির কাছে সবিনয়ে জানতে চাইলেন যে তাঁর লেখা রামকথা কি এতটাই খারাপ হয়েছে যে মহর্ষির খারাপ লেগে চোখে জল এসেছে! হনুমানকে বুকে টেনে নিয়ে বাল্মীকি বললেন, না বৎস। এটা এতটাই ভালো হয়েছে যে সবাই তোমার রামায়ণ পাঠ করার পর আমার

রামায়ণ আর কেউ পড়বে না। একথা শোনা মাত্রই হনুমান বিন্দুমাত্র অপেক্ষা, তিলমাত্র দ্বিধা না করে কলার পাতাগুলো ছিঁড়ে কুটি-কুটি করলেন। তারপর একখানা বড়ো পাথরে বেঁধে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দিলেন সমুদ্রের জলে। তারপর হাসিমুখে বললেন, আমার রামায়ণ কেউ কোনোদিন আর পড়বে না। বাল্মীকি যারপরনাই বিস্মিত। অবাক হয়ে জানতে চাইলেন হনুমান এমন কাণ্ড কেন করলেন! কেন নষ্ট করে ফেললেন তাঁর এই সুন্দর সৃষ্টি! বিনয়াবনত স্বরে হনুমান উত্তর দিলেন— মহর্ষি, আমার রামায়ণের চাইতে লোককল্যাণে আপনার রামায়ণের পাঠ অনেক বেশি প্রয়োজন। আপনি রামচরিত রচনা করেছেন লোক হিতার্থে। বিশ্বের কল্যাণের জন্য। আমি লিখেছি কেবল প্রভুর কথা স্মরণে রাখার জন্য। কিন্তু তিনি যখন স্বয়ং আমার মানসে আমার সারা অঙ্গে, আমার হৃদয়ে অন্তরাত্মায় মিশে রয়েছেন, একাত্ম হয়ে রয়েছেন তখন আর বাহ্যিক আঙ্গিকের প্রয়োজন কী!

এ থেকে বোঝা যায় যে মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন সমকালীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। তাতে যেমন সর্বশ্রেণীর মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, প্রজাপালনের গুরুত্ব, রাজা বা শাসকের কর্তব্য, এমনকী রাজভবনের অন্দরমহলের প্রাসাদ রাজনীতির কথা আছে, তেমনি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, মহাত্মাদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মানের পরাকাষ্ঠাও রয়েছে। আছে বীরত্বের কাহিনি, অস্ত্র ধারণ করে পরাক্রমী যুদ্ধের কাহিনি। সেই সঙ্গে রয়েছে সামাজিক সাম্য এবং ব্যক্তি মাহাত্ম্যের কথা , ত্যাগ তিতিক্ষার কথা, পিতৃসত্য পালনে বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে বনবাস জীবনের মতো কঠোর ও দুঃসহ জীবনযাপনের কথাও। আছে নারীর সম্মান রক্ষার কথা, পত্নীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ববোধ এবং স্বামীর প্রতি আদর্শ নারীসত্তার কথা। সেই সঙ্গে আপামর মানুষের প্রতি দরবিগলিত করুণার কথা, সকলের সঙ্গে একাত্মতার কথা। বাল্মীকির রামায়ণে যেমন অযোধ্যা নগরীর বিন্যাস ও বৈভবের বর্ণনা আছে, তেমনি সম্পদে বিনম্রতার উদাহরণও আছে। আছে মাতৃশক্তির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার কথা। ভাইয়ে-ভাইয়ে মধুর সম্পর্ক এবং একের জন্য অন্যের সর্বস্ব ত্যাগের কথাও। সর্বোপরি রামচরিত্রের মাধ্যমে মানবত্ব থেকে মহামানবত্ব তথা পুরুষ থেকে পুরুষোত্তম এবং মহামানবত্ব থেকে দেবত্বে উত্তরণের কথা। এমনকী গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বিচারে অতি সূক্ষ্ম ও কঠিন জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথাও বাদ যায়নি। এদিক থেকে দেখলে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনযাত্রা বা রামায়ণ ও রামকথা মহাকাব্যাকারে রচিত হলেও তা তৎকালীন সময়ের একখানা প্রামাণ্য দলিল তথা ইতিহাস।

শ্রীরাম যেমন হনুমানের আস্থা, অখণ্ড বিশ্বাস; হনুমান তেমনি রামচন্দ্রের বিশ্বস্ত, পরিপূর্ণ আস্থাভাজন সেবক। একজন ঈশ্বরের অবতার, অন্যজন্য নিজগুণে ঈশ্বরতুল্য। শ্রীরামকে আলাদা করে হনুমানের জীবনচর্যা, মহত্ত্বের কথা যেমন ভাবা যায় না তেমনি ‘প্রভু’র চরণাশ্রিত হনুমানকে বাদ দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের সামগ্রিক জীবনের কথা পরিপূর্ণ হয় না।

শ্রীরামচন্দ্র ঐতিহাসিক পুরুষ। অপরিমিত গুণাবলীর ধারক হিসেবে মর্ত্যে অবতাররূপী ঈশ্বর। এই সমস্ত কারণেই শ্রীরামচন্দ্র কেবল ভারতবর্ষের নয়, সারা বিশ্বের আদর্শতম পুরুষ, সকলের অন্তরাত্মার আকাঙ্ক্ষিত ভগবান। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত কারণেই রামনামে মানুষের মনপ্রাণ যেমন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে তেমনি তাঁর জীবনকাহিনি শুনতে, পড়তে; রামকথা, রামযাত্রা, রামপালা দেখতে মনপ্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। রামচন্দ্রের বিগ্রহ ও মন্দির দর্শন করার জন্য মানুষের অপরিসীম উন্মাদনার কারণ তো এটাই। হনুমানের মতো একজন মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিধর ও মহাবীরের মতো বনবাসী নেতা তো এজন্যই প্রশ্নাতীত হৃদয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে ‘প্রভু’ জ্ঞানে সেবা করে গেছেন। তাঁর চরণতলে নতজানু হয়ে প্রশ্নহীনভাবে সব সংকট মোচনের জন্য সবকিছু করে গেছেন। শ্রীরাম ও বীরহনুমান— ভগবান ও ভক্ত ভিন্ন দেহে একাত্ম। হনুমান যেমন রামভক্ত, শ্রীরামচন্দ্রও তেমনি হনুমান অনুরক্ত। শ্রীরাম যেমন হনুমানের আস্থা, অখণ্ড বিশ্বাস; হনুমান তেমনি রামচন্দ্রের বিশ্বস্ত, পরিপূর্ণ আস্থাভাজন সেবক। একজন ঈশ্বরের অবতার, অন্যজন নিজগুণে ঈশ্বরতুল্য। শ্রীরামকে আলাদা করে হনুমানের জীবনচর্যা, মহত্ত্বের কথা যেমন ভাবা যায় না তেমনি ‘প্রভু’র চরণাশ্রিত হনুমানকে বাদ দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের সামগ্রিক জীবনের কথা পরিপূর্ণ হয় না।

এজন্যই রামমন্দির মানেই সেখানে কোথাও না কোথাও হনুমানের বিগ্রহেরও স্থান রয়েছে। পুনর্নির্মিত শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরে তো তিনি বস্তুত দ্বারপাল। স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের নিযুক্ত অযোধ্যার সংকট মোচনকারী, রক্ষক। করজোড়ে দাঁড়িয়ে রামভক্তদের গর্ভগৃহে প্রবেশ করার জন্য স্বাগত জানাচ্ছেন।

জীবন চরিতের মহত্ত্বের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিন বা বীরহনুমান জয়ন্তীও কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশ্বের অন্তত ৫০-৬০টি দেশে লক্ষাধিক মন্দিরে প্রতি বছর রামনবমীতে যেমন শ্রীরামচন্দ্রের পূজার্চনা হয়ে থাকে, তেমনি বহু দেশে অসংখ্য হনুমান মন্দিরে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে হনুমানের জন্মতিথি—হনুমান জয়ন্তী। ধ্বনি ওঠে ‘জয় বজরঙ্গবলী কী।’ □

দাস্যভাবের এক বিরলতম উদাহরণ বীর হনুমান

গোপাল চক্রবর্তী

রামায়ণ ও বিভিন্ন পুরাণে মহাবীর হনুমানের চরিত্রটি একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বাস্তবিক পক্ষে হনুমানের মতো সর্ব গুণাধার চরিত্র জগতে দুর্লভ। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি, বাৎসল্য, আনুগত্য, সেবকত্ব, বিশ্বস্ততা, সেবা পরায়ণতা প্রভৃতি গুণের সমন্বয়ে হনুমান চরিত্রটি চিরভাস্বর, চির অম্লান, চির স্মরণীয় এবং অমরত্ব লাভ করেছে। আদি কবির রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা ও যুদ্ধকাণ্ডে হনুমান চরিত্রের উপস্থাপনা সমগ্র মহাকাব্যটিকে যেন অন্য মর্যাদা দান করেছে। পরম ভক্ত হনুমানের দাস্যানুদাস্য ভাবের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ভগবৎ সাধনার মূল ধারাটিকে প্রোথিত ও উপস্থাপিত করে মহর্ষি চিরশাশ্বত সাধন সত্যটিকে পরিপোষিত করে পরম নিভৃতে স্থাপন করেছেন। হনুমানচরিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শিক্ষার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে উন্মোচন করেছেন।

রামায়ণ ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থাদিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে হনুমানের যে জন্মবৃত্তান্ত পাওয়া যায় তা রহস্যে ঘেরা হলেও অপার মহিমান্বিত। যেমন পরম রূপবতী অপ্সরা পুঞ্জকস্থলী এক ঋষির শাপে ভূতলে বানরকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা বানর রাজ কুঞ্জর। কুঞ্জরের এক অসামান্যা রূপবতী কন্যা অঞ্জনা। সুমেরু পর্বতের বানরাধিপতি কেশরীর সঙ্গে অঞ্জনার

> **শিবপুরাণে (২/২/১৪-৩৯)-এ শিব স্বয়ং বলেছেন— লক্ষ্মণকে শেষনাগের অংশাবতার, শ্রীরামচন্দ্র বিষ্ণুর পূর্ণাবতার এবং হনুমান শিবের অবতার অর্থাৎ রুদ্রাবতার। স্কন্দ পুরাণে শিবের স্বয়ং হনুমানরূপে আবির্ভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে। কূর্ম্মপুরাণে বলা হয়েছে হনুমান শিবের খণ্ডরূপ।**

বিবাহ হয়। একদিন অঞ্জনা মানবীর রূপ ধারণ করে অপরূপ সাজে সজ্জিতা হয়ে পার্বত্য ভূমিতে ভ্রমণ করছিলেন। পবনদেব তাকে দেখে মোহিত হয়ে আলিঙ্গন করেন। পতিব্রতা অঞ্জনা ক্রুদ্ধ হয়ে পবনদেবকে তিরস্কার করলে পবনদেব তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, ---হে বরাননে, শান্ত হও। তোমার কোনো অহিত আমার দ্বারা সাধিত হবে না। আমি মানসিক ভাবে তোমাতে উপগত হয়েছি— তাঁর ফলে তোমার এক মহাবীর্যবান, বুদ্ধিমান, ভক্তি ও কর্তব্যের পরাকাষ্ঠা, প্রবল পরাক্রান্ত আমার সমান বেগবান পুত্র লাভ হবে।

অঞ্জনার পবিত্রতা নষ্ট না করে শুধুমাত্র স্পর্শ করেই পবনদেব অঞ্জনার কোলে এক মহাবলশালী পুত্র উপহার দেন। কপিরাজ কেশরীর ক্ষেত্রজ পুত্র শ্রীহনুমান রামায়ণ ও বিভিন্ন পুরাণে 'পবননন্দন', 'বায়ুপুত্র', 'মারুতাত্মজ' ইত্যাদি নামে বিভূষিত হয়েছেন। কিছু কিছু পুরাণ আবার অন্যকথাও বলে। যেমন শিবপুরাণে (২/২/১৪-৩৯)-এ শিব স্বয়ং বলেছেন--- লক্ষ্মণকে শেষনাগের অংশাবতার, শ্রীরামচন্দ্র বিষ্ণুর পূর্ণাবতার এবং হনুমান শিবের অবতার অর্থাৎ রুদ্রাবতার। স্কন্দ পুরাণে শিবের স্বয়ং হনুমানরূপে আবির্ভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে। কূর্ম্মপুরাণে বলা হয়েছে হনুমান শিবের খণ্ডরূপ। শৈশবে নানা বীরত্বব্যঞ্জক কার্যকলাপে অঞ্জনাপুত্র দেবতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেবতারা এই মহাবলশালী শিশুকে নানাপ্রকার বর দিয়ে পরিপুষ্ট করেন। শৈশবে এই শিশুর চপলতা রোধের জন্য ইন্দ্র মৃদু বজ্রাঘাত করেছিলেন, তাতে শিশুর হনু (চোয়াল) ভেঙে যায়। ব্রহ্মা তাকে সুস্থ করেন। হনুভঙ্গ হয়েছে তাই ইন্দ্র তার নাম রাখেন হনুমান। সূর্য তাঁর তেজের শতভাগের একভাগ প্রদান করেন এবং সর্বশাস্ত্র বিশারদ করেন হনুমানকে। কুবের, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবতারাও হনুমানকে বর দিয়ে বলিষ্ঠ করেন। ব্রহ্মাও হনুমানকে বর দিয়ে বলেন—

—বায়ু, তোমার এই পুত্র অমিত্রগণের ভয়প্রদ, মিত্রগণের অভয়প্রদ, অজেয় কামরূপী, অব্যাহতগতি ও কীর্তিমান হবে।

হনুমানের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ আমরা পাই রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে। জটায়ুর নির্দেশে রাম-লক্ষ্মণ— সীতার অন্বেষণে এগিয়ে চলেছেন দক্ষিণে। পথে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য, এখানে এক শক্তিশালী পার্বত্য উপজাতির বাস। তাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও লোকব্যবহার স্বতন্ত্র। তবে তাদের উপর সভ্যতার প্রভাব এসে পড়েছে। তারা সংস্কৃত শিক্ষা করে। বেদ অধ্যয়ন এবং বৈদিক মন্ত্রে আচার অনুষ্ঠান পালন করে। সেখানে ঋষ্যমূক পর্বতে বানররাজ বালীর ভয়ে অনুজ সুগ্রীব অমাত্যগণ-সহ আত্মগোপন করে আছে। পর্বতের শৃঙ্গদেশ থেকে রাম-লক্ষ্মণকে দেখে সুগ্রীব তাঁদের বালীর চর ভেবে ভীত ও বিচলিত হন। অমাত্য হনুমানকে পাঠালেন তাঁদের পরিচয় জানতে। হনুমান ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এলেন রাম-লক্ষ্মণের সামনে। বিনীত ভাবে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় তাঁদের বললেন—

—আপনারা দেবকান্তি। সর্বাঙ্গে রাজকীয় গরিমা প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ আপনারা জটা ও চীরবল্কলধারী হয়ে কঠোর-তপা ব্রহ্মচারীর মতো এই নির্জন অরণ্যে কেন বিচরণ করছেন? আপনাদের দৃষ্টিতে সিংহের বিক্রম। বৃষস্কন্ধ বীরের মতো গতি। কিন্তু নিঃশ্বাসে যেন শোকের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। কোষমুক্ত খড়্গ। আপনাদের হস্তে শরাশন দেখে অরণ্যের প্রাণীসকল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। আপনারা মনুষ্য হয়েও দেবদর্শন। আপনারা কেন এখানে আগমন করেছেন? এই পর্বতে সুগ্রীব নামে এক ধার্মিক কপিরাজ আছেন। তিনি তাঁর অগ্রজ কর্তৃক রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে বড়ো দুঃখে এই অরণ্যে বিচরণ করছেন। তাঁরই আদেশে আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আমি সুগ্রীবের মন্ত্রী পবনাত্মজ হনুমান।

হনুমানের এই বিনীত বচনে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন। লক্ষ্মণকে বললেন--- যে সুগ্রীবের সঙ্গে আমরা সখ্য স্থাপন করতে চাই ইনি তাঁরই মন্ত্রী। এঁর বাক্য শুনে মনে হয় ইনি ঋক্, সাম, যজুর্বেদে সুপণ্ডিত। স্বরাক্ষর নিপুণ, ইঙ্গিতজ্ঞ ও বাক্‌পটু। ইনি নিশ্চয় বিশেষ ভাবে ব্যাকরণ অধিগত করেছেন। কথার মধ্যে একটিও অপশব্দ নেই। নির্ভুল সুললিত উচ্চারণ। সুমিত কণ্ঠ। মিতবাক্। এঁর বাক্য দ্রুত নয়, আবার বিলম্বিতও নয়। শান্ত মধ্যম স্বরে কথা বলেন। কথা বলার সময় চোখে, মুখে, ললাটে ও অবয়বে কোনো বিকার দেখলাম না। এঁর কথা শুনলে মনে আনন্দ হয়। লক্ষ্মণ, তুমি এঁর সঙ্গে আলাপ কর। (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড-৩।২৬-৩৫)

তখন লক্ষ্মণ এগিয়ে গিয়ে বললেন— হে বিদ্বান, আমরা বানররাজ সুগ্রীবের গুণাবলী জানি। আমরা তাঁরই অন্বেষণ করছি।

রামের আদেশে লক্ষ্মণ নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন— পুণ্যে, দানে, যজ্ঞে, যশে, বীরত্বে যিনি সকল প্রাণীর আশ্রয়, সেই রঘুনাথ রামচন্দ্র আজ সুগ্রীবের সাহায্যপ্রার্থী।

হনুমান বললেন— সুগ্রীবের পরম সৌভাগ্য। বালী তাকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছে। তাঁর পত্নীকেও হরণ করেছে। তিনি দুঃখিত, ভীত ও অসহায়। আপনাদের মতো বলবান সহায় হলে তাঁর মঙ্গল হবে। আর সীতা অন্বেষণে আমরাও আপনাদের সাহায্য করব।

এই কথা শুনে লক্ষ্মণ ভ্রাতা রামকে বললেন— পবননন্দন হনুমানের কথায় মনে হচ্ছে, আমাদের এখানে আসার ফলে সুগ্রীব ও আমাদের উভয় পক্ষেরই কার্যসিদ্ধি হবে। হনুমানের কথা এবং তাঁর মুখের প্রসন্নভাব দেখে মনে হয় তিনি মিথ্যা কথা বলছেন না।

প্রসন্নমুখবর্ণশ্চ ব্যক্তং হৃষ্টশ্চ ভাষতে।
নানৃতং বক্ষ্যতে বীরোশ হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।।
(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৪/৩২)

ফঃ ৪

হনুমান তখন রাম-লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের কাছে নিয়ে গেলেন। হনুমানের উদ্যোগে অগ্নিসাক্ষী করে, মন্ত্র উচ্চারণ ও শপথ বাক্য পাঠ করে রাম ও সুগ্রীব মিত্রতা স্থাপন করলেন। সুগ্রীব বললেন— আপনাকে মিত্ররূপে পেলাম। এবার দেবতারা নিশ্চয় আমাকে কৃপা করবেন। আমি রাজ্য থেকে বিতাড়িত। আমার পত্নীও অপহৃতা। আমি বালীর ভয়ে ভীত। আমাকে অভয় দান করুন। এই অগ্নি প্রদক্ষিণ করে আপনার অভয় হস্ত দান করুন।

শ্রীরামচন্দ্র প্রীত হয়ে সুগ্রীবের হস্ত ধারণ পূর্বক তাকে আলিঙ্গন করলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন— তোমার স্ত্রী অপহরণকারী বালীকে আমি বধ করব।

'বালিনং তং বধিষ্যামি তব ভার্যাপহারিণম্'।

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৫/২৬)

সীতা উদ্ধারের প্রস্তুতি পর্ব শুরু হলো। উদ্যোক্তা হনুমান। হনুমান ছিলেন সর্বশাস্ত্র বিশারদ— 'সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ' (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড— ৪/৫৪/৫) বাল্মীকি আরও বলেছেন, হনুমান হলেন—

'নিশ্চিতার্থোঽর্থতত্ত্বজ্ঞ কালধর্ম বিশেষবিৎ'

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—২৯/৬)

হনুমানের বাক্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রামের মিত্র সুগ্রীব সীতা উদ্ধারে উদ্যোগী হলেন এবং সীতার অন্বেষণে বানর সেনাদের সবদিকে পাঠাতে শুরু করলেন। তখন সীতার অনুসন্ধানের জন্য সুগ্রীব 'মহাবলী' হনুমানকে বিশেষ ভাবে সম্বোধন করে যে সব উক্তি করেছিলেন তাতে হনুমান চরিত্রের যে অমূল্য বিদ্যালঙ্কাররাজির পরিচয় আমরা পাই তা বেশ বিশেষত্বপূর্ণ। সুগ্রীব বলেছেন— হে বীর হনুমান, মাতা সীতার সন্ধান যাতে পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ কর। তুমি দূরদর্শী রাজনীতিবিদ্, বল, বীর্য, বুদ্ধি বিক্রম সবই তোমাতে বিদ্যমান। দেশ কাল পাত্রানুযায়ী কখন কী করণীয়— এই সব নীতিতত্ত্বেও তুমি বিশারদ্।

তারপর হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন, লঙ্কায় গমন, সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ। এমন একটা সময়ে হনুমান লঙ্কায় আগমন এবং সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, যার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত রাবণ সীতাকে নানা প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে দুর্বল করার চেষ্টা করছিল। রাবণ সীতাকে এক বছর সময় দিয়েছিল দশমাস অতিক্রান্ত দুই মাস মাত্র বাকি, সীতা ভাবছেন তাঁর জীবদ্দশা আর মাত্র দুই মাস। এই সময়ে হনুমান এসে তাঁকে নতুন আশার আলো দেখালেন, মুক্তির ইঙ্গিত পেলেন বন্দিনী জনক নন্দিনী। প্রথমে হনুমানকেও সীতা বিশ্বাস করতে পারেননি, তাঁর দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়েছিলেন। হনুমান বললেন— আমাকে সন্দেহ করবেন না। বিশ্বাস করুন। এই দেখুন শ্রীরামচন্দ্র প্রদত্ত অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়। আমি হনুমান, শ্রীরামচন্দ্রের দাস। আমি রামচন্দ্রের বার্তা নিয়ে এসেছি। তিনি কুশলে আছেন। দেবী আপনি শোক করবেন না। পদ্মলোচন শ্রীরামচন্দ্র আপনার সন্ধান জানেন না। আমার কাছে সংবাদ পেয়ে শীঘ্রই তিনি তাঁর মহতীসেনা নিয়ে লঙ্কা আক্রমণ করে রাবণকে সবংশে নিহত করে আপনাকে উদ্ধার করবেন। আপনার শোকে আপনার চিন্তায় সতত তিনি ব্যথিত ও বিহ্বল হয়ে আছেন।

'নিত্যং ধ্যানপরো রামো নিতংশোকপরায়ণ'।

দুঃখমিশ্রিত প্রসন্নমুখে সীতা বলছেন— তোমার কথাগুলি বিষ মিশ্রিত অমৃতের মতো। শ্রীরাম আমার জন্য অনন্যমনা হয়ে আছেন এ সংবাদ আমার কাছে অমৃততুল্য। কিন্তু তিনি শোকার্ত হয়ে দুঃখ পাচ্ছেন এ সংবাদ আমার কাছে বিষবৎ। কবে তিনি লঙ্কা জয় করবেন। কবে আমার পতি এসে আমাকে দেখবেন— 'কদা দ্রক্ষ্যতি মাং পতিঃ।'

সীতাকে ম্রিয়মাণ দেখে হনুমান বললেন— দেবী, যদি ইচ্ছা করেন, তবে আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। রামনাম উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে তার মধ্যে আমি আকাশপথে আপনাকে রামের কাছে নিয়ে যাবো।

সীতা বললেন— তোমার প্রজ্ঞা ও বল, তোমার তেজ ও গতি আমি বুঝতে পারছি। তোমার সেই ক্ষমতা সম্পর্কেও আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু রাক্ষসেরা তোমাকে আক্রমণ করবে। তুমি নিরস্ত্র, একা। তবুও যদি জয়ী হও তা হলেও শ্রীরামের যশোহানি হবে। তার চেয়ে শ্রীরাম স্বহস্তে রাবণ এবং রাক্ষসকুল ধ্বংস করে আমাকে উদ্ধার করলে জগতে শ্রীরামের যশ ঘোষিত হবে।

যদি রামো দশগ্রীবমিহ হত্বা সরাক্ষসম্।
মামিতো গৃহ্য গচ্ছেৎ তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ।।

(সুন্দরকাণ্ড—৩৭/৬৪)

এবার লঙ্কা থেকে হনুমানের ফেরার পালা। মাতা সীতা অভিজ্ঞান স্বরূপ তাঁর চূড়ামণি হনুমানের হাতে দিয়ে বললেন— এই দিব্য চূড়ামণি দেখলেই রামচন্দ্র এক সঙ্গে আমার, আমার জননীর এবং পিতা দশরথের কথা মনে করবেন।

এবার লঙ্কার উদ্যান ধ্বংস করলেন হনুমান। বহু রক্ষীকে হত্যা করলেন। লঙ্কার দুর্ভেদ্য নগর প্রাকার ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করে সীতার অভিজ্ঞান-সহ শ্রীরামচন্দ্রের সকাশে ফিরে গেলেন। রাম সীতার অভিজ্ঞান দেখে এবং সম্যক অবগত হয়ে লঙ্কা আক্রমণের সিদ্ধান্ত দৃঢ় করলেন। এই সময়ে রাবণের দ্বারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে লঙ্কা ত্যাগ করে শ্রীরামচন্দ্রের শরণ নিতে রামের শিবিরে উপস্থিত হয়েছেন রাবণানুজ বিভীষণ। তাঁর আগমনে শীর্ষ সেনাদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সুগ্রীব, অঙ্গদ, শরভ, জাম্ববান প্রমুখ বিভীষণের আগমন সহজ ভাবে মেনে নিতে পারলেন না। এঁরা সবাই বিভীষণকে সন্দেহের চোখে দেখছেন। এখানে বিভীষণ সম্পর্কে হনুমানের যে বক্তব্য তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সকলের যুক্তি নস্যাৎ করে হনুমান শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন— প্রভু, আপনার সচিবেরা যা বললেন তা আমি সমর্থন করি না। কার্যক্ষেত্রে আচরণ দেখে মানুষের দোষগুণ বিচার সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে সে অবসর নেই।

বিভীষণ অসময়ে অস্থানে এসে উপস্থিত হয়েছেন বলেও আমি মনে করি না। রাবণের উৎপীড়নে বিচলিত হয়ে আপনার বিক্রমের কথা বিবেচনা করে নিজের স্বার্থ ও মঙ্গল ভেবেই বিভীষণ এখানে এসেছেন। তাঁকে গুপ্তচর দিয়ে প্রশ্ন করানো হলে তিনি অযথা শঙ্কিত হয়ে উঠবেন। যদি মিত্রভাব নিয়ে এসে থাকেন তাহলে তাঁর মন বিব্রত ও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠবে। তাছাড়া প্রশ্ন করে কি মানুষের মনের ভাব জানা যায়? আমি তার হাবভাব, কথাবলা ভালো করে লক্ষ্য করেছি। মানুষ বাইরে যতই ভান করুক তার ভিতরের মনোভাব ব্যক্ত হয়ে পড়বেই। কিন্তু বিভীষণের সরল বাক্য, প্রসন্ন মুখ, সুস্থির নিঃসংকোচ ভাব দেখে আমার মনে কোনো সন্দেহ জাগেনি।

শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে বিভীষণের মিত্রতার মাধ্যম ছিলেন হনুমান। রাক্ষসদের সঙ্গে ভয়ংকর যুদ্ধে হনুমান একে একে বধ করেন জম্বুমালী, ধূম্রাক্ষ, অকম্পনের মতো অপরাজেয় রাক্ষস যোদ্ধাদের। রাবণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রহারে অচৈতন্য করে লক্ষ্মণকে যখন বন্দি করে লঙ্কায় নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হনুমান বজ্রমুষ্ঠি প্রহারে রাবণকে মূর্ছিত করে লক্ষ্মণকে উদ্ধার করেন এবং শ্রীরামের কাছে নিয়ে যান। মহাবলী কুম্ভকর্ণের শূলাঘাতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সুগ্রীবকে রক্ষা করেন হনুমান। মেঘনাদের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ আহত হলে 'বৈদ্যরাজ সুষেণের পরামর্শে বিশল্যকরণী এনে দিয়ে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছিলেন হনুমান। মহীরাবণের হাত থেকেও রাম-লক্ষ্মণকে উদ্ধার করেন সংকটমোচন হনুমান। ভক্তিতে বীরত্বে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, তপস্যায়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে হনুমান সমগ্র রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের মধ্যে এক বিরলতম চরিত্র। ■

বালিগঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে সংস্কৃত ভাষা সম্মেলন

সংস্কৃত ভাষা সম্মেলন সমিতির উদ্যোগে এবং সংস্কৃতভারতী কলকাতার সহযোগিতায় গত ২৯ মার্চ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ, সংস্কৃতভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত অধ্যক্ষ ড. তন্ময় কুমার ভট্টাচার্য এবং হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের কর্ণধার ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। সম্মেলনের প্রথম সত্রে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃত ভাষা সম্মেলন সমিতির সহ সভাপতি ড. অমল কুমার মণ্ডল এবং দ্বিতীয় সত্রে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি ড. গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য। সম্মেলনে সমিতির উপদেষ্টা মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ড. শিবনারায়ণ সেনের সম্পাদনায় 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃতভাষা' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী-সহ সমাজের দুইশতাধিক সংস্কৃতানুরাগীর উপস্থিতিতে সংস্কৃতভাষায় নিহিত প্রধান দশটি বিষয়ের (বেদ, পুরাণ, দর্শন, বেদান্ত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন ও চিকিৎসাসাস্ত্র, ধর্ম ও অর্থশাস্ত্র, লৌকিক সাহিত্য এবং ব্যাকরণ) ওপর আলোকপাত করেন দশজন বিশিষ্ট বক্তা। এছাড়াও সংস্কৃত গান, স্তোত্র, নৃত্য, সংস্কৃত সম্ভাষণ, ক্যুইজ, শ্রুতিনাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এক বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও ছিল।

মেদিনীপুর জেলা সংস্কার ভারতীর দোল উৎসব

গত ২৫ মার্চ মেদিনীপুর জেলা সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে মেদিনীপুর শহরে গণপতি বোসের বাগানবাড়িতে এক মনোরম পরিবেশে দোল উৎসব এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথি বরণের পর রাধা-কৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্বলন এবং সংস্কার ভারতীর ভাবসংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। উপস্থিত ছিলেন বলাই বসু, দেবাশিস ঘোষ, গুরদয়াল সিংহ এবং জেলা সম্পাদক তিমির বর্মন।

সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা চারখানা সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন। 'রং দে চুনরিয়া' পরিবেশন করেন সংস্থাপক সদস্য আশিস কর্মকার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও কর্ম, দোলপূর্ণিমা এবং হোলিকা দহন বিষয়ে ভাষণ দেন জেলা সভাপতি পূর্ণেন্দু মাঝি। অনুষ্ঠানে নটরাজ ডান্স সার্কেলের কর্ণধার এবং নৃত্যশিল্পী সবিতা সাহা মিত্রকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বেশ কয়েকটি নৃত্য সুন্দরভাবে পরিবেশন করেন। শ্রীমতী নবনীতা বসুর ছাত্র-ছাত্রীরাও কয়েকটি নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশিত হয়। নাল বাজিয়ে শোনান নয়ন চক্রবর্তী। সংস্কার ভারতীর শিল্পী ঝুমঝুমি চক্রবর্তী, পল্টু চক্রবর্তী, রবি প্রামাণিক সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অরূপ চট্টোপাধ্যায় এবং তপন সামন্ত।

গাজোলে ঘাকশোল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন

গত ৬-৭ এপ্রিল মালদা জেলার গাজোলের নিকট ঘাকশোল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এর সঙ্গেই সম্পন্ন হয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পরিচালিত জনজাতি কল্যাণ কেন্দ্রের বার্ষিক উৎসব। প্রথমদিন গাজোল থেকে ঘাকশোল পর্যন্ত দীর্ঘ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় দিন ভজন-কীর্তন, পূজাপাঠ, বৈদিক শান্তিযজ্ঞ এবং হিন্দুধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই দুদিন এলাকার প্রচুর মানুষের সমাগম হয় এবং মানুষ দীক্ষা গ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিশ্বপ্রেমানন্দজী মহারাজ, স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ-সহ বহু নবীন ও প্রবীণ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত। বিকেলে ধর্মসভার আগে গোবিন্দ সরকারের পরিচালনায় লাঠিখেলা প্রদর্শন হয়। ধর্মসভায় ভাষণ রাখেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, অদ্বৈতচরণ দত্ত এবং মুটুকেশ্বর পাল।

সুন্দরবনের গদখালিতে ভূমি সুপোষণ

গত ২ এপ্রিল সুন্দরবন জেলার বাসন্তী খণ্ডের গদখালি গ্রামে ভূমি সুপোষণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত গ্রাম বিকাশ সংযোজক দুলাল চন্দ্র নস্কর, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সুন্দরবন জেলা প্রচারক বুদ্ধদেব দাস, জেলা টোলির সদস্য সুকুমার বাগ। ভূমি সুপোষণ বিধি অনুসারে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পাঁচ দম্পতি-সহ আরও ৪ জন এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও গ্রামবাসীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে গোমাতা পূজা হয় এবং গায়ত্রীমন্ত্র-সহ গোমাতা প্রদক্ষিণ করা হয়। এরপর ভারতমাতার মূর্তিপূজা ও যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। পূজা সমাপন্তে সকলের হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

দোল উপলক্ষ্যে হাওড়ার শিবপুরে নগরসংকীর্তন

প্রতি বছরের মতো দোল উপলক্ষ্যে এবারও গত ২৫ মার্চ হাওড়া শহরের শিবপুরে ৪৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী নগর সংকীর্তন-সহ অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয়। শিবপুর কেশব স্মৃতি ভবনে পঞ্চানন

চট্টোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে পূজাপাঠ সম্পন্ন হয়। বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী শ্রীমতী গোপা চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শ্রীমতী কুমকুম রায় ও শ্রীমতী অভয়া নাগ দ্বৈতকণ্ঠে ভক্তিগীতি পারিবেশন করেন। এরপর মন্দিরতলা থেকে নগর সংকীর্তন শুরু হয়ে ষষ্ঠীতলা, হাজার হাত কালীতলা, শিবতলা, ধর্মতলা পরিক্রমা করে মন্দিরতলাতে সমাপ্ত হয়। সেখানে তপন কুণ্ডু দোলপূর্ণিমার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত ছিলেন রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন নাগ, স্বপন নাগ, অতনু রায়, কাঞ্চন ভট্টাচার্য সঞ্জিত দে, হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, প্রণব রক্ষিত, অশোক রায়, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রাণা রায়, অসীম চন্দ্র, পুরুষোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

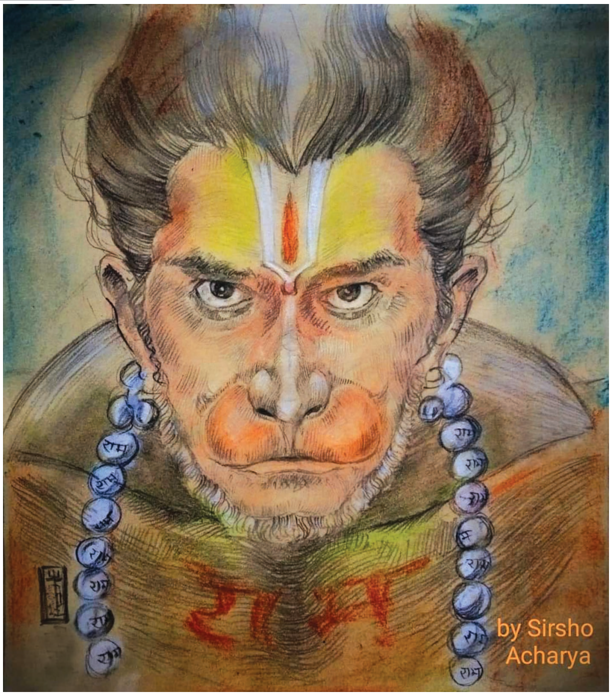

বীরত্বের দিব্যরূপই তাঁর স্বরূপ, সংকটমোচন হনুমানে তাই আস্থা শ্রীরামচন্দ্রের

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

উদীয়মান বালার্কের মতো কান্তিমান পবননন্দন, বানর শিরোমণি হনুমান। তাঁর বর্ণ অশোক ফুলের মতো, তাঁর চোখ সোনার মতো, তিনি বিপুল ও বিশাল। শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে দূত হয়ে তিনিই গিয়েছিলেন লঙ্কায়। বীর্য ও ধৈর্যের আধার তিনি; তিনি প্রভুভক্ত, বানরোত্তম, বলবীর্যশালী দৈব্যসত্তা। জনকদুহিতা সীতাদেবীর খবর নিয়ে আসতে তিনি সক্ষম ছিলেন। শতযোজন সাগর অতিক্রম করতেও তিনি কৃতবিদ্য। তাই তিনি লঙ্কা অভিমুখে গমন করলেন। সাগরকে গোষ্পদ বিবেচনা করে তিনি কৃতকার্যও হলেন।

লঙ্কায় অশোককাননে সীতামাতার দর্শন পেলেন তিনি। শ্রীরাম বিরহে-চিন্তনে সতত নিমগ্ন সীতা; শোকাতুরা, একবেণী হয়ে বসে আছেন। চারিদেকে শক্তিশালী ঘোরদর্শনা রাক্ষসীর দল ঘিরে রয়েছে তাঁকে। সময় উপযুক্ত বুঝে বৃক্ষে উপবেশন করেই সংস্কৃত ভাষায় সীতামাতার শ্রবণ-গোচরের জন্য মধুর বচনে শ্রীরাম কাহিনি বিবৃত করতে লাগলেন। হনুমানের ভয়ংকর রূপ দর্শনে প্রথমে সীতাদেবী মূর্চ্ছা গেলেন। পরে জ্ঞান ফিরলে আশ্বস্ত হয়ে কথোপকথন শুরু হলো। হনুমান জানালেন, তিনি শ্রীরামচন্দ্রের দূত, তিনি বানররাজ সুগ্রীবের সচিব। প্রমাণস্বরূপ শ্রীরাম-প্রদত্ত অঙ্গুরীয় সীতামাতাকে দেখালেন। বললেন, কমললোচন শ্রীরাম সীতামাতার সংবাদ পেলেই ঋক্ষ ও বানরসৈন্য সমেত লঙ্কায় উপস্থিত হবেন। সীতাদেবীকে উদ্ধারও করবেন তিনি। দু'জনের সাক্ষাতের প্রমাণস্বরূপ আপন শিরোরত্ন কাপড়ের মধ্যে থেকে বার করে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করতে হনুমানকে অর্পণ করলেন মা সীতা। সেই সঙ্গে শোনালেন, চিত্রকূট পর্বতের উপবনে সংঘটিত রাম-সীতার একান্ত গোপন এক ঘটনা, যা শুনে শ্রীরামচন্দ্র বুঝতে সমর্থ হবেন, সত্যিই হনুমানের সঙ্গে সীতাদেবীর সাক্ষাৎ হয়েছে।

সীতামাতাকে নিজের পৃষ্ঠে স্থাপন করেই রামচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করতে সক্ষম ছিলেন পবননন্দন। কিন্তু তাতে শ্রীরামের যশোহানি ঘটতো। গমনের বেগে সীতাদেবী সমুদ্রে পড়ে যেতেও পারতেন। রাক্ষসগণও পশ্চাদ্ধাবন করে সীতাদেবীকে আক্রমণ করতে পারতো। যেহেতু যুদ্ধে জয়-পরাজয় সুনিশ্চিত নয়। তাই বিবেচনা করে সীতাদেবী একলা হনুমানের সঙ্গে যেতে রাজি হলেন না। বললেন, রাবণ ও অন্যান্য রাক্ষসবধ করেই যেন শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

সীতাদেবীর সাক্ষাৎ পাবার পর অতিরিক্ত কাজ হিসেবে প্রবল পরাক্রমে ভয়াবহ মূর্তিতে লঙ্কানগরীকে ত্রস্ত করে তুললেন হনুমান। শত্রুপক্ষের বল যাচাই করতে গেলে বল প্রয়োগ করেই দেখে নেওয়া উচিত। এই বিবেচনা করেই রাক্ষস-সংহারে নামলেন তিনি। সংগ্রামের সময় শত্রুর সামর্থ্য কীরূপ তা তো জানা দরকার! তখন রাবণের প্রমোদকানন অশোকবন বিনষ্ট করতে উদ্যত হলেন। শুরু হলো বিশাল বৃক্ষ উৎপাটন এবং বৃক্ষভঙ্গের সহস্র ঘটনা। তাতে রাক্ষসীদের নিদ্রা গেল টুটে। খবর গেল রাবণরাজার কাছে। ভয়ংকর ক্রোধে আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন রাবণ। এদিকে হনুমান উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করছেন, রঘুবীরের জয়, মহারাজ সুগ্রীবের জয়--- 'জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ। রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেনাভিপালিতঃ।।'

হনুমান লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। কখনও লৌহতোরণ খুলছেন, তো কখনও প্রাসাদ দগ্ধ করে দিচ্ছেন। রথযুদ্ধে ধাবমান জম্বুমালীকে সহজেই নিহত করলেন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসা মন্ত্রীপুত্রদের সসৈন্য বধ করলেন। গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন করে বধ করলেন বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্ধর্ষ, প্রঘস, ভাসকর্ণ প্রভৃতি পঞ্চ সেনাপতিকে। ঘোড়া দিয়েই ঘোড়া মারছেন, হাতি দিয়েই হাতি। সৈন্য দিয়ে সৈন্যদের মারছেন এক এক করে। আর নবোদিত সূর্যের মতো কান্তিময় রাবণপুত্র অক্ষয় কুমারের চরণদ্বয় দৃঢ়ভাবে ধরে সহস্র-ঘূর্ণন সম্পন্ন করে নিক্ষিপ্ত করলেন দূরে, সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ হয়ে গেল কুমারের

দেহ। তার আগেই চপেটাঘাতে বধ করেছেন কুমারের অষ্ট অশ্ব। এবার রাবণের আহ্বানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধরথে চড়ে এলেন। তার ব্রহ্মাস্ত্রে অবশেষে নিশ্চেষ্ট হবার ভান করলেন হনুমান। তখন বল্কলরজ্জুতে বেঁধে কটুক্তি করতে করতে রাক্ষসেরা তাঁকে রাবণের সভায় নিয়ে গেল।

রাবণ ভয়ংকর ক্রুদ্ধ। তিনি অনতিবিলম্বে হনুমানকে বধ করতে চান। কিন্তু দূতকে প্রাণদণ্ড দেওয়া যায় না! এ নীতিবিরুদ্ধ কাজ, সতর্ক করলেন বিভীষণ। কিন্তু অন্য দণ্ড তো দেওয়া যেতে পারে! তাই রাবণ আদেশ দিলেন, হনুমানের লেজে কার্পাস বস্ত্র জড়িয়ে জ্বালানি তেল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করতে। এ শাস্তি কিন্তু লঙ্কানগরীর পক্ষে আদৌ সুখকর হলো না। দেহ পরিবর্ধন করে জ্বলন্ত লাঙ্গুল দিয়েই তিনি গোটা লঙ্কা ছারখার করে ছাড়লেন। গৃহ পুড়ছে, রাক্ষসেরা মরছে, চারিদিকে উচ্চরোদন। প্রাসাদতোরণ দগ্ধ। তার মধ্যেই সীতাদেবী রক্ষা পেয়েছেন। সীতাদেবীরই ইচ্ছায় ও প্রার্থনায় হনুমানের লেজ আগুনে দগ্ধ হলো না। লঙ্কাকাণ্ড করে অবশেষে তিনি সমুদ্রে ডুবিয়ে লেজের আগুন নেভালেন।

এবার তিনি লম্ফ দিয়ে সাগর লঙ্ঘন করে ফিরবেন। তাই উঠছেন সূর্যকিরণে উজ্জ্বল আরিষ্ট পর্বতে। ত্রিশ যোজন উচ্চ এবং দশ যোজন বিস্তৃত সেই পর্বত। তখন কেমন লাগছে তাকে? যেন পর্বতের বনরাজি হয়েছে তাঁর বসন, যেন পর্বতশৃঙ্গে সম্পৃক্ত অভ্ররাজি তাঁর উত্তরীয়, যেন পর্বতগাত্রে নির্ঝর-ধৌত ধাতব-শিলা হয়েছে তাঁর চোখ। ক্রমশ তাঁর দেহ বাড়িয়ে তুলছেন প্রস্তুতি নিয়ে। সেই চাপ পর্বতের সইতে পারা সহজ কথা নয়! শিলাস্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শিলাবাসী প্রাণীসকল মহাত্রাসে রসাতলে যাচ্ছে। গুহাবাসী সিংহের গর্জন মনে হচ্ছে যেন মহা-আর্তনাদ! পর্বতবাসী গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, বিদ্যাধরদের অবস্থাও তথৈবচ। তাঁরা অন্তরীক্ষে সাময়িক আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন এ যাত্রায়। সমগ্র পর্বত ভূতলে প্রবিষ্ট হতে বাকি নেই। এবার তিনি মহালম্ফ দিয়ে উচ্চ আকাশে উঠলেন। তিনি নিজেও যেন এক সপক্ষ-পর্বত। কী অসীম শক্তি।

এদিকে গগনতলে সাগরের অসীমতা। ওদিকে আকাশে নানা বর্ণের মেঘ। এই শোভন-সাগরের উপরে অভ্র-জালিকা ভেদ করে মহাবেগে বীর হনুমান এগিয়ে চলেছেন। সেই ঘন মেঘ জালিকার মধ্যে কখনও তাঁর দৃশ্যরূপ, কখনও অদৃশ্য। মধ্য পথে মৈনাক পর্বত ছুঁয়ে তিনি মহেন্দ্র পর্বত দেখতে পেলেন। সমুদ্রের উত্তর কিনারে তারই জন্য প্রতীক্ষারত জাম্বমান প্রভৃতি বানরবাহিনী। তাদের দেখে তিনি মেঘের মতো গর্জন করছেন। পর্বতগুহার মধ্যে প্রবলবেগে প্রবিষ্ট বায়ু যে শব্দ সৃষ্টি করে, এ তেমনই গর্জন। এ হর্ষ নিনাদ! এ নিনাদ কৃতকার্যে সফলতার বার্তা তা বুঝতে পেরে বানরকুল আনন্দে আত্মহারা হলেন। তারা বৃক্ষশাখা থেকে শাখান্তরে, শৃঙ্গ থেকে শৃঙ্গান্তরে লম্ফঝম্ফ করে তাদের আনন্দ- অনুভতি প্রকাশ করতে লাগলেন। হর্ষে, প্রতি হর্ষে চারিপাশ পরিপূর্ণ। এমনই আনন্দ-গর্জনের মধ্যে মহেন্দ্র পর্বতের ঝরনামালায় আকাশ থেকে পতিত হলেন পবননন্দন। বানরেরা আনন্দিত। সেই রমণীয় বনপ্রদেশের মধ্যে তারা বৃক্ষশাখা চয়ন করে পেতে দিলেন আসন, ভোজনের জন্য উপহার দিলেন সুস্বাদু ফলমূল। বানরকুলের আনন্দ-অন্তর দেখে কে! তারপর... ▯

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব তিথি রামনবমী

প্রদীপ মারিক

শ্রীরামচন্দ্র ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। ভগবান বিষ্ণু পৃথিবীতে মানব অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন অসুরদের অত্যাচার শেষ করার জন্য। বিশেষ করে দশানন রাবণকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই মানব রূপে মর্ত্যে এসেছিলেন বিষ্ণু। রাবণ ছিলেন ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত, দেবতারা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারছিলেন না, রাবণকে পরাজিত করতে ভগবান বিষ্ণুর রামরূপে আগমন। পৃথিবীতে ধর্মরক্ষার জন্য রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করেন তিনি, সেই যুদ্ধে রাবণ প্রাণও হারান। রামভক্তদের কাছে শ্রীরামের এই বিজয় ধর্মযুদ্ধে জয়ও বটে। রামনবমীর পবিত্র দিন শুক্লপক্ষের নবম দিনে হিন্দু পঞ্জিকার চৈত্র মাসের নবম দিন। চৈত্রের নবম দিনে বসন্তের নবরাত্রি পালন করা হয়। রামনবমী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু উৎসবের মধ্যে একটি। এই নবমীতে দেবী পার্বতী আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই এই দিনকে 'বিশ্বমাতৃ দিবস' হিসেবে পালন করেন সনাতনীরা। রামনবমী দিনটি শ্রীরামের মাহাত্ম্য বর্ণনার দিন। বিশ্বের প্রত্যেক হিন্দু মন্দিরে গিয়ে, প্রার্থনা করে, উপবাস করে, আধ্যাত্মিক কথা শোনে এবং ভজন বা কীর্তন গেয়ে উৎসব উদ্‌যাপন করে। যেহেতু রামের জন্মদিন তাই ভক্তরা রামের একটি মূর্তি একটি দোলনায় রেখে শিশুর মতো পূজা করে। রামের জীবন সম্পর্কে মহাকাব্য রামায়ণে কিংবদন্তীতে কয়েকটি শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা।

উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রামমন্দির। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমিতে অবস্থিত রামমন্দির। মন্দিরটির উদ্বোধন হয় ২২ জানুয়ারি ২০২৪, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কঠিন যম নিয়ম পালন করে রামলালাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীরামের পদস্পর্শে ধন্য তামিলনাড়ুর রামেশ্বরম। ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের রামনাথপুরম একটি শহর। এটি পামবান দ্বীপে অবস্থিত পামবান চ্যানেল দ্বারা প্রধানভূমি ভারত থেকে পৃথক এবং শ্রীলঙ্কার মান্নার দ্বীপ থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বারাণসীর মতো এটি হিন্দুদের কাছে ভারতের পবিত্রতম স্থান এবং চার ধাম তীর্থযাত্রার অংশ বলে মনে করা হয়। রামেশ্বরম ভারতের থেকে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছানোর সবচেয়ে নিকটতম বিন্দু এবং ভূতাত্ত্বিক প্রমাণগুলি নির্দেশ করে। রামসেতু কি ইচ্ছা করলে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নিজেই তৈরি করতে পারতেন না? কিন্তু বানর সেনাদের দিয়ে সেই সেতু বানিয়ে দেখিয়ে দিলেন সকলে মিলেই কাজ করতে হয়, এটাই ইচ্ছাশক্তি। এই শিক্ষাই সনাতনী হিন্দু ধর্মালম্বীরা সমগ্র পৃথিবীকে শিখিয়ে এসেছে। রামসেতু ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে একটি সংযোগ সেতু ছিল। এর কাছেই রামেশ্বর স্তম্ভ অবস্থিত। সীতা মা-কে উদ্ধারের পরে ফিরে এসে শিবের আরাধনা করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। রাবণকে বধ করে তিনি যে ব্রহ্মহত্যা করেছিলেন, সেই পাপ খণ্ডনের জন্যই শিবের আরাধনা করেন। তামিলনাড়ুর এই স্থান হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র হিসেবে গণ্য হয়। তেলেঙ্গানার ভদ্রাচলম মন্দিরটি মহাকাব্য রামায়ণের সঙ্গে যুক্ত।

পুরাণ অনুসারে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র, তাঁর সহধর্মিণী সীতা এবং ভাই লক্ষ্মণ, তাদের চোদ্দ বছরের বনবাসের অংশ হিসেবে দণ্ডক বনে অবস্থান করেছিলেন। শ্রীরামের কৃপায় একটি পাথর ভদ্র নামক মানবে পরিণত হয় যাকে মেরু পর্বতের পুত্র বলে মনে করা হতো। ভদ্রাচলম মন্দিরের গর্ভগৃহে অবস্থিত ভগবান রামকে স্বয়ম্ভু বলে মনে করা হয়। শ্রীরাম পদ্মাসনের ভঙ্গিতে উপবিষ্ট, সীতামাতা তাঁর কোলে উপবিষ্ট। রামের চার হাতে শঙ্খ, চক্র, ধনুক ও তির। লক্ষ্মণ তার বাম দিকে দাঁড়িয়ে আছে। বিহারে অবস্থিত সীতামঢ়ী জনক রাজার কন্যা সীতার জন্মস্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মহাকাব্য রামায়ণের প্রধান চরিত্র এবং সীতাকে উৎসর্গীকৃত একটি মন্দির সীতামঢ়ী শহরের কাছে অবস্থিত। রামনবমী উপলক্ষ্যে শুধু ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সৌভ্রাতৃত্বের রথযাত্রা সংগঠিত হয়। শ্রীরামের নামে উৎসবের নামকরণ করা হলেও উৎসবে সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের প্রতি শ্রদ্ধা অন্তর্ভুক্ত থাকে, শ্রীরামের জীবন কাহিনিতে তাদের গুরুত্ব দেওয়া হয়।

রামনবমী উৎসব সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য ঈশ্বরের অবতরণ করাকে নির্দেশ করে। রামনবমী উৎসব উদ্‌যাপন শুরু হয় সূর্যদেবতাকে প্রসন্ন করার জন্য ভোরবেলা জলম (জল) নিবেদনের মাধ্যমে। ভগবান রাম, তার মহৎ গুণাবলীর

জন্য পরিচিত, তিনি একজন সাহসী ও গুণী রাজপুত্র হয়েও অতি সাধারণ ভাবে জীবনযাপন করেছিলেন। তার জীবন এবং দুঃসাহসিক কাজগুলির মধ্যে অন্যতম রাজপুত্র হয়েও তিনি বনে নির্বাসিত হয়েছিলেন, রাক্ষস রাজা রাবণ দ্বারা সীতাকে অপহরণ করা এবং হনুমান ও বানর বাহিনীর সাহায্যে রাবণকে বধ করা এ সবই মহাকাব্য রামায়ণে চিত্রিত হয়েছে। পুরাণ অনুযায়ী সূর্যের বংশধররা রামের পূর্বপুরুষ ছিলেন। আজকের দ্রুতগতির বিশ্বে ভগবান রামের শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সত্য, সহানুভুতি ও কর্তব্যের উপর তার জীবনের চ্যালেঞ্জগুলি নেভিগেট করার জন্য একটি নিরবধি গাইড হিসেবে কাজ করে।

সমাজ যখন নৈতিকতা জর্জরিত হয়, তখন ভগবান রামের জীবনের গল্প এবং প্রতিকূলতার উপর তার বিজয় বিশ্বাস এবং ধার্মিক শক্তির অনুপ্রেরণামূলক অনুস্মারক হিসেবে কাজ করে। ভগবান রামের জন্মের সঙ্গে যুক্ত পৌরাণিক কাহিনি প্রাচীন হিন্দু মহাকাব্য। কিংবদন্তি অনুসারে, ভগবান রাম অযোধ্যা নগরীতে রাজা দশরথ এবং রানি কৌশল্যার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে রাম ও তাঁর তিন ভাই যথাক্রমে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম সম্পর্কে এক পৌরাণিক কাহিনির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কাহিনি অনুযায়ী রাজা দশরথের তিন রানি কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার পুত্র সন্তান না হওয়ার পর পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন করেন তিনি। প্রসাদ হিসেবে স্বয়ং অগ্নিদেব যজ্ঞ থেকে পায়েস নিয়ে বেরিয়ে আসেন। সেই পায়েস খান তিন রানি। এর পরই রাজা দশরথের তিন রানি গর্ভধারণ করেন। চৈত্র শুক্ল নবমী তিথিতে কৌশল্যার গর্ভ থেকে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভ থেকে ভরত ও সুমিত্রার গর্ভ থেকে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্ম নেন। সেই পায়েস খেয়ে কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলেও সুমিতার দুটি পুত্র হয়। এ প্রসঙ্গে জানা যায় যে কৌশল্যা ও কৈকেয়ী নিজের অংশের থেকে একটু একটু পায়েস সুমিত্রাকে খাইয়ে দেন, এ কারণে তিনি দুই পুত্র সন্তানের জননী হন।

আবার প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী একটি কাক সেই পায়েসের বাটি নিয়ে উড়ে যায়। তাতে অবশিষ্ট কয়েক দানা পায়েস অঞ্জনা খেয়ে নেন। পরে তাঁর গর্ভ থেকে রামভক্ত বজরংবলী জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামচন্দ্র একজন আদর্শ রাজা হিসেবে সমগ্র বিশ্বে পরিচিত। রামায়ণে বর্ণিত তাঁর জীবন এবং শিক্ষাগুলি ভক্তদের জন্য একটি পথপ্রদর্শক আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে, তাদের একটি পুণ্যময় জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করে। উৎসবটি একজনের জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ ও নীতিকে সমুন্নত রাখার গুরুত্বের প্রতীক। রামনবমীর দিন সাধারণত দিনব্যাপী উপবাস পালন করা হয়, সূর্যোদয়ের আগে বা সূর্যোদয়ের সময় শুরু হয় এবং পরের দিনের সূর্যোদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই সময়ে, রামকথা, ভগবান রামের গল্প এবং পবিত্র হিন্দু ধর্মগ্রন্থ যেমন শ্রীমদ ভাগবত এবং রামায়ণ অধ্যায়ন এবং শ্রবণ করা হয়। রামলালা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বাতাবরণ সৃটি হয়েছে। রামলালার এবার সূর্য অভিষেকের পালা। সূর্যের রশ্মি সোজা প্রবেশ করবে রামমন্দিরের গর্ভগৃহে, স্পর্শ করবে রামলালার কপাল। সেই মাহেন্দ্রক্ষণের আর খুব বেশি দেরি নেই।

ভগবান রাম ছিলেন করুণা, দয়া এবং ধার্মিকতার প্রকৃত মূর্ত প্রতীক। তার সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তার চারপাশের মানুষের প্রতি সর্বদা নম্র ও ভদ্র ছিলেন। তাই রামনবমী তার ধর্ম ও ধার্মিকতার পথ অনুসরণ করার এবং সর্বদা সকলের সঙ্গে সদয় আচরণ করার জন্য একটি অনুস্মারক। সুন্দর কাণ্ডে রামের বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'শান্ত শাশ্বতমপ্রমেয়মনঘং নির্বাণশান্তি প্রদং/ ব্রহ্মাশম্ভু ফণীন্দ্রসেব্যমনিশং বেদান্তবেদ্যং বিভুম্। রামাখ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং মায়ামনুষ্যং হরিং/বন্দেহং করুণাকরং রঘুবরং ভূপালচূড়ামণিম্।। নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েহস্মদীয়ে/ সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা ভক্তি প্রয়চ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে/ কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসং চ।।' যেখানে রামকে শান্ত মানসিকতা সম্পন্ন শাশ্বত নির্বাণ ও পরম শান্তি দাতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে ব্রহ্মা, শিব ও শেষনাগ যাঁর বন্দনা করেন, যিনি দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ও জগৎ কল্যাণের জন্য মনুষ্য রূপ ধারণ করেছেন, সেই করুণাপতিই রাম রঘুবর। অগস্ত্য সংহিতা অনুযায়ী দুপুর নাগাদ রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে পুনর্বসু নক্ষত্র, কর্কট লগ্ন ও মেষ রাশি ছিল। শাস্ত্রমতে রামচন্দ্রের জন্মের সময় সূর্য ও অন্য ৫ গ্রহের শুভ দৃষ্টি ছিল তাঁর ওপর।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে, ভগবান ব্রহ্মা প্রভু হওয়ার সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, 'যিনি সমস্ত ঐশ্বর্য বা ধন, সমস্ত বীর্য বা শক্তি, সমস্ত যশ বা খ্যাতি, সমস্ত শ্রী বা সৌন্দর্য, সমস্ত জ্ঞান বা জান, সমস্ত বৈরাগ্য বা ত্যাগের অধিকারী তাকে ভগবান বলা হয়, ভগবানের পরম পুরুষত্ব।' সিবিআরআই-এর সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ড. দেবদত্তা ঘোষ বললেন, রামনবমীর দিন দুপুর ১২টা থেকে ১২টা ৬ মিনিট পর্যন্ত সূর্যরশ্মি অযোধ্যা রামমন্দিরে রামলালার মস্তিষ্কে তিলক করবে। অপ্টো ম্যাকানিক্যাল সিস্টমের মাধ্যমে সূর্য কিরণকে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করানো হবে এবং এর দ্বারা রামলালার সূর্যতিলক সম্পন্ন হবে। রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরে প্রথমবার পালিত হচ্ছে রামনবমী উৎসব। রামনবমীতে ভক্তরা সেই অনিন্দসুন্দর দৃশ্যের সাক্ষী থাকবে। রামনবমীতে রামলালার কপালে সূর্যের আলো দিয়ে তিলক কাটা হবে। তুলসীদাস তাঁর 'রামচরিত মানস' কাব্যে বলেছেন, 'রঘুকুল তিলক সুজন সুখ দাতা। আয়উ কুসল দেব মুনি ত্রাতা।।' রঘুরামের এই তিলক হবে রামের মহিমান্বিত তিলক। ধার্মিক মানুষকে এই তিলক আনন্দ দেবে। জগৎ সংসারকে মঙ্গলময়, সুস্থ রাখবে। দেব, মুনিঋষিদের একমাত্র ত্রাতা হবেন শ্রীরাম। তাই তার তিলক খুবই তাৎপর্যবাহী। রামনবমীতে রামলালার 'রঘুকুল তিলক' হবে 'সূর্য তিলক'। শুধু ভারতবর্ষে নয় সারা বিশ্বে পালিত হয় রামনবমী।

প্রতি বছর ডারবানের হিন্দু মন্দিরগুলিতে এই দিনটি ঐতিহ্যের একটি অঙ্গ হিসেবে কাজ করা হয়। ত্রিনিদাদ, টোবাগো, গায়ানা, সুরিনাম, জ্যামাইকা, অন্যান্য ক্যারিবিয়ান দেশ, মরিশাস, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, জার্মানি, আমেরিকা এবং অন্যান্য অনেক দেশে রামনবমী পালন করা হয়। বাংলাদেশে রামনবমী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা বের করা হয়। সারা বিশ্বের সর্ব ধর্মের ধর্মাবলম্বী মানুষরা বোঝেন শ্রীরামচন্দ্রই তাদের ত্রাণকর্তা। □

ভারতের লোকসভা নির্বাচন বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল নির্বাচন

ধর্মানন্দ দেব

ভারতীয় সংবিধান রচয়িতারা অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে সংবিধান মোতাবেক পূর্ণ স্বাধিকার দিয়েছেন। সংবিধানের ৩২৪নং অনুচ্ছেদ অনুসারে লোকসভা নির্বাচনে তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নির্বাচনের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের হাতে। পাশাপাশি ভারতীয় সংসদ ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন প্রণয়ন করে নির্বাচন পরিচালনার পূর্ণ আইনগত এক্তিয়ার নির্বাচন কমিশনের ওপর অর্পণ করেছে। বিভিন্ন সময় এই জনপ্রতিনিধিত্ব আইন দুটি বারবার সংশোধন করে আরও সময়োপযোগী করা হয়েছে। যাতে করে উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে কমিশন সফল হয়।

বহুদলীয় গণতন্ত্র হওয়ায় ভারতের জাতীয় নির্বাচনে বরাবরই রেকর্ড সংখ্যক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের দল মিলিয়ে এবারের নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে ২ হাজারের বেশি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল। প্রত্যেকটি দল আলাদা আলাদা নির্বাচনী প্রতীকে নির্বাচনে লড়ছে। যেমন ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মফুল, অন্যান্য দল হাতি থেকে শুরু করে বাইসাইকেল, চিরুনি ও তিরের মতো নানা প্রতীকে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। সবগুলো প্রতীকই ইভিএমে থাকবে। এর ফলে ভোটারদের পক্ষে সহজেই ভোট দেওয়া সম্ভব হবে। নির্বাচনে ভোটারদের বিভ্রান্ত করতে অনেক সময়ই বিরোধী প্রার্থীরা জনপ্রিয় প্রার্থীদের বিপক্ষে একই নামধারী 'ডামি প্রার্থী' দাঁড় করিয়ে দেয়। যেমন ২০১৪ সালের নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে জনপ্রিয় অভিনেত্রী হেমামালিনীর বিরুদ্ধে আরও দুই হেমামালিনীকে প্রার্থী করেছিল। এ ধরনের 'ডামি প্রার্থী' দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়।

খরচ যাতে প্রার্থীর নির্বাচনী খরচের ঊর্ধ্বসীমা লঙ্ঘন না করে, তা নিশ্চিত করতেই নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে খরচ নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন পঞ্জাবের জলন্ধরে এক কাপ চায়ের দাম ১৫ টাকা বেঁধে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ওই একই টাকা ধরা হয়েছে একটি সিঙাড়ার দাম। অর্থাৎ কোনও অতিথিকে এক কাপ চা ও একটি সিঙাড়া খাওয়ালে সেই বাবদ মোট ৩০ টাকা অবধি খরচ করতে পারবেন প্রার্থী। সেখানে ছোলে-বাটুরের দাম প্রার্থীদের জন্য ৪০ টাকায় বেঁধে দিয়েছে কমিশন। আবার মধ্যপ্রদেশের মাণ্ডলায় সেই চায়ের দাম ধরা হয়েছে সাত টাকা, সিঙাড়ার দাম সাড়ে সাত টাকা। আবার মধ্যপ্রদেশের বালাঘাটে চায়ের দাম ৫ টাকা ধরা হলেও সিঙাড়ার দাম ধরা হয়েছে ১০ টাকা। একই ভাবে দেশের প্রতিটি প্রান্তে চা, সিঙাড়া, ইডলি, পোহা এমনকী মুরগি বা পাঁঠার মাংসের দামও বেঁধে দিয়েছে কমিশন। অতিথিদের খাওয়া বাবদ খরচ যাতে সেই সীমা টপকে না যায়, সেদিকে নজর রাখতে হবে খোদ প্রার্থী বা তাঁর দলকে। গত লোকসভা ভোটে প্রার্থীপিছু প্রচার-খরচের ঊর্ধ্বসীমা ছিল ৭০ লক্ষ টাকা। পাঁচ বছরের ব্যবধানে তা একলাফে বেড়েছে এবার ২৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এই নির্বাচনে প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য খরচের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ৯৫ লক্ষ টাকা করেছে কমিশন।

নির্বাচনে কেবল প্রার্থী বা দলগুলোরই খরচ হচ্ছে না, দেশটির নির্বাচন কমিশনকেও ভোট আয়োজনে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। ১৯৫২ সালে স্বাধীনতার পর প্রথম লোকসভা নির্বাচনে ৪০১ আসনে (দ্বৈত সদস্যের আসন-সহ) ৫৩টি দলের ১৮৭৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। সেবার ভোটকেন্দ্র ছিল ১.৯৬ লক্ষ। ২০১৯ সালে এই পরিসংখ্যান বেশ কয়েকগুণ বৃদ্ধি হয়েছিল। অন্যদিকে দলের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছিল প্রার্থীর সংখ্যা। ৫৪৩টি নির্বাচনী এলাকায় ৬৭৩টি দলের ৮,০৫৪ জন প্রার্থী ছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৫২ সালে লোকসভা ভোট করাতে খরচ হয়েছিল ১০ কোটি টাকা। পরের বছর খরচ খানিকটা কমে গিয়েছিল। ১৯৫৭ সালে লোকসভা ভোট করাতে মাত্র ৫.৯ কোটি টাকা খরচ হয়। এই খরচ ছিল সর্বনিম্ন। আবার ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচন করাতে খরচ হয়ে যায় ৩৮৭০ কোটি টাকা। ২০১৯ সালে নির্বাচন কমিশনের শুধু প্রশাসনিক খরচ একটি প্রথম সারির ইংরেজি পত্রিকার প্রতিবেদন অনুসারে, ২৩৬.৬ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ সালের বাজেটে সেই অঙ্কই হয়েছে ৩৪০ কোটি টাকা। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে নির্বাচন কমিশনের জন্য অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। যার মধ্যে লোকসভা ভোটের খরচও ধরা হয়েছে। অর্থমন্ত্রক অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করেছে ৩১৪৭.৯২ কোটি টাকা। সেই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের প্রশাসনিক খরচ বাবাদ বরাদ্দ করা হয়েছে ৭৩.৬৭ কোটি টাকা। বাজেটের নথি অনুযায়ী, এবার বেড়েছে নির্বাচন কমিশনের কর্মীর সংখ্যা। এবার ভোটকর্মী ও নিরাপত্তা কর্মী মিলে সংখ্যাটা প্রায় দেড় কোটির বেশি। এছাড়াও দেশে প্রায় ১১ লক্ষ ভোট কেন্দ্র রয়েছে এবং ৯৭ কোটি নথিভুক্ত ভোটার রয়েছেন।

লোকসভা নির্বাচন পরিচালনার জন্য যে এত টাকা খরচ হয় তা নির্ভর করে অনেক ক'টি বিষয়ের উপর। লোকসভা নির্বাচনের খরচ সেই বিষয়গুলির বৃদ্ধির সমানুপাতিক হয়। অর্থাৎ যদি সেই বিষয়গুলি ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী হয় তবে নির্বাচনের খরচও বাড়ে। শুধু যে ভোটার সংখ্যাই বেড়েছে এমনটা নয়। প্রার্থী, দল, ভোটকেন্দ্র, ইভিএম এবং নির্বাচনী এলাকার সংখ্যাও বেড়েছে। তাই নির্বাচনী খরচ বেড়েছে। আর সবমিলিয়ে এখনই অনুমান করা যায় দেশের ইতিহাসে শুধু নয়, বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল হতে যাচ্ছে এবারের লোকসভা নির্বাচন। এছাড়াও বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিটি রাজ্যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। যদি এক দেশ এক নির্বাচন ব্যবস্থা হয় তবে এই খরচ অনেকটাই কমবে নতুবা এই খরচ দিনের পর দিন বাড়ছে আরও বাড়বে।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

ভারতে হনুমৎ শক্তির সার্বিক জাগরণ

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

সংকটমোচন মহাবীর বজরঙ্গবলী শ্রীহনুমান হলেন মর্যাদাপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও অনুগামী। তাঁর ভগবদ্-ভক্তি তুলনাহীন, সীমাহীন। সেই শ্রেষ্ঠ ভক্তস্বরূপ শ্রীহনুমানের অন্তরের, হৃদয়ের এবং শরীরের মধ্যে বিরাজমান যে চালিকাশক্তি, তার উৎস রামভক্তি। শ্রীভগবানের দাসানুদাস শ্রীমহাবীরের দেহের ও অন্তরের সেই শক্তি হলো হনুমৎ শক্তি। এই শক্তি অসম্ভবকে করে তুলতে পারে সম্ভব, সাধারণকে করে তুলতে পারে অসাধারণ, ভক্তের আধ্যাত্মিক প্রাপ্তির ভাণ্ডকে করে তুলতে পারে পূর্ণ, ভগবদ্-ভক্তির সংকটকালে দেশে ও সমাজে ঘটাতে পারে ভক্তিভাবের অতুলনীয় সমাবেশ, সাধনারত ব্রহ্মচারীর দেহে-মনে সঞ্চার করতে পারে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য, সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর আঘাত নেমে আসার চরমতম মুহূর্তে গড়ে তুলতে পারে নিদারুণ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ এবং অধর্মের পরাজয় ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে পারে ধর্মের জয়ঘোষ। তাঁর এই কল্পনাতীত শক্তি সাধু-সন্তদের রক্ষায় যেমন সহায়ক, তেমনই ভারতের বুকে ভগবান প্রদর্শিত আদর্শ শাসন বা রামরাজ্য স্থাপনের মূল ভিত্তি। পুরাণে বর্ণিত অষ্ট চিরঞ্জীবীদের অন্যতম শ্রীহনুমান (অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসঃ হনুমানশ্চ বিভীষণঃ। কৃপাচার্য পরশুরাম চ সপ্তেতেয় চিরঞ্জীবীনঃ।।), তিনি অমর, তাঁর নাম স্মরণ মাত্রেই ব্যক্তি ভাগ্যবান ও দীর্ঘায়ু হন। স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও মা সীতার থেকে তিনি অজর-অমর হওয়ার বর প্রাপ্ত। তিনি কখনও বৃদ্ধ হবেন না, তাঁর কখনও মৃত্যু ঘটবে না। রামায়ণের সমস্ত চরিত্র মোক্ষলাভ করলেও শ্রীহনুমান সব সময়ের জন্য পৃথিবীতে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। শ্রীরামের অমোঘ নির্দেশ অনুসরণ করে তিনি অযোধ্যা নগরীর চিরকালীন দ্বারপাল। অনন্তকাল তিনি রক্ষা করবেন সরযূ তীরের অযোধ্যা ধাম। তাঁকে দর্শন করে, তাঁকে প্রার্থনা করে, তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করেই ভক্তগণ লাভ করবেন শ্রীরামচন্দ্রের ভব্য মন্দিরে রামলালা সকাশে যাওয়ার অনুমতি। যতদিন মানুষের হৃদয়ে ভগবান শ্রীরাম জীবিত থাকবেন, ততদিন শ্রীহনুমান পৃথিবীতে অবস্থান করবেন, দুষ্টের দমন-শিষ্টের পালনে সহায়ক হবেন।

দেবাদিদেব শিবের একাদশতম রুদ্র অবতার পবনপুত্র শ্রীহনুমান। অমিত বলশালী, অসীম শক্তির আধার মহাবীর বাল্যকালে সূর্যকে মুঠোবন্দি করার জন্য সূর্যের দিকে অগ্রসর হলে বিশ্বজগৎকে যেন গ্রাস করে ঘনান্ধকার। সেই সময়ের দেবতাদের সম্মিলিত স্তবে তুষ্ট পবনপুত্র সূর্যকে মুক্তি দেন এবং সূর্যের বরে সূর্যের সমগ্র তেজপ্রভার এক শতাংশের অধিকারী হন। সুগ্রীবের মন্ত্রী শ্রীহনুমান দম্ভ ও অহংকারের প্রতীক রাবণের স্বর্ণলঙ্কা জ্বালিয়ে দেন। এই লঙ্কাদহন হলো শত্রুপুরীতে ঢুকে শত্রু ও অধর্মকে নাশ করার, সীমাহীন অহমিকাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার এক ঐতিহাসিক ও পরমার্থিক শিক্ষা। শ্রীরাম ইহলীলা সংবরণ করার লক্ষ্যে সমাধিস্থ হওয়ার আগে শ্রীহনুমানকে ইহলোকেই অমরত্বের আশীর্বাদ করে যান যাতে তিনি মর্ত্যলোকের সকল ভক্তদের সর্বদা রক্ষা করতে পারেন। শ্রীহনুমানের বন্দনা করেই কবি তুলসীদাস হনুমান চালিসা রচনা করেন যা সমকালীন প্রেক্ষাপটে ভক্তদের দ্বারা পঠিত, গীত ও সদা সমাদৃত। এই 'হনুমান চালিসা' পাঁচালি আধুনিক যুগে, বর্তমান কালে মহাবীর শ্রীহনুমানকে স্মরণের মাধ্যমে আপামর ভক্তদের দেহে-মনে হনুমৎ শক্তি জাগরণের অন্যতম মাধ্যম। সাধারণ মানুষের জীবন প্রণালীতে শ্রীভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পণের ভাব সঞ্চার ছাড়াও অধর্মের বিরুদ্ধে সার্বিক প্রতিরোধ, প্রয়োজনে আত্মরক্ষা এবং বৃহৎ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ভক্তদের হৃদয়ে-মনে সংকল্প ও ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি এই হনুমান চালিশা পাঠের ফলশ্রুতি।

যখন অধর্মের প্রবল প্রতাপে ধর্মের অবস্থান হয়ে পড়ে

ম্রিয়মান, পাপের ভারে ধরিত্রী হয় ভারাক্রান্ত, পাপীদের অত্যাচারে সাধু-মহাত্মা, ভক্তদের অবস্থা হয় শোচনীয়, সভ্যতা-সংস্কৃতি হয় আক্রান্ত, হীনমন্যতা ও গ্লানিবোধে আচ্ছন্ন, সেই সময় রাষ্ট্রভাব বিকাশে, শ্রীভগবানের রাজ্য স্থাপনে, দেশ-সমাজ ও জাতির পুনরুত্থানে ভগবানের প্রতি সেই সম্পূর্ণ সমর্পণভাব জারিত হনুমৎ শক্তির জাগরণ হয়ে ওঠে এক ও একমাত্র বিকল্প। এহেন যুগসন্ধিক্ষণে কুনীতি-দুর্নীতির হাতে পণবন্দি, পরাধীন, স্বতন্ত্রতাহীন, ভয়াবহ অত্যাচার ও নির্যাতনের নাগপাশে বদ্ধ, অসহায় জাতির প্রয়োজন সেই কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার পথ অনুসন্ধানে সংকল্প গ্রহণ। অযোধ্যা শ্রীরামজন্মভূমিতে বিধর্মীদের ধারাবাহিক আক্রমণ এবং তার পরিণতিতে তৎকালীন মন্দির ধ্বংসের মাধ্যমে বিতর্কিত ধাঁচা নির্মাণ— হিন্দু সমাজের আস্থা, ভক্তি ও ধর্মবিশ্বাসের ওপর ছিল প্রবল প্রহার এবং ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর চরমতম আঘাত। শ্রীরামজন্মভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ১৯৯০-এর দশকে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রবাদী আন্দোলন ছিল দেশব্যাপী হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণ এবং সনাতনীদের সঙ্ঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একটি ঐতিহাসিক ধর্মসংগ্রাম। অগণিত উজ্জীবিত, দেশপ্রেমিক স্বয়ংসেবক ও করসেবকদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, আত্মবলিদানে রূপ পরিগ্রহ করা শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলন ছিল দেশ জুড়ে ধর্ম রক্ষার ও শ্রীভগবানের মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশকে ওই বিতর্কিত ধাঁচার কলঙ্ক হতে মুক্ত করার এক সর্ব ব্যাপী লড়াই। দেশবাসীকে ত্যাগব্রতে অনুপ্রাণিত করতে, দেশের স্বাভিমান প্রতিষ্ঠায়, দেশের আত্মসম্মান ও হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারকল্পে,শ্রীভগবান প্রদত্ত এই কাজে পুণ্যশ্লোক সাধু-সন্ন্যাসীবৃন্দ ও ত্যাগব্রতী করসেবকদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও সনাতন ধর্মের প্রতি নিবেদিত সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দেশ জুড়ে গ্রহণ করে হনুমৎ শক্তি জাগরণ কর্মসূচি। ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষায়, সভ্যতার পুনর্নির্মাণ এবং আধ্যাত্মিকতার বিকাশে সেই কর্মসূচির ভূমিকা ও প্রভাব ছিল সর্বাত্মক। রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিকে প্রতিরোধের মাধ্যমে দেশবাসীর মধ্যে সেই শক্তি জাগরণের ফলশ্রুতিতে বিকশিত হয় জাতীয়তাবোধ। রাষ্ট্রবাদী বিচারধারা জারিত সেই জাতীয়তাবোধ পরবর্তীতে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিগত পুনরুত্থানে সহায়ক হয়।

২০০৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে 'রামসেতু' ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ-প্রতিরোধে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দ্বারা পুনরায় সংগঠিত হয় হনুমৎ শক্তি জাগরণ অভিযান। রামসেতুর স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেই আন্দোলনও হয় সফল ও কার্যকরী। শ্রীরামজন্মভূমিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভব্য মন্দির প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১০ সালের আগস্ট মাসে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তৎকালীন সভাপতি অশোক সিঙ্ঘল 'সন্ত উচ্চাধিকার সমিতি' ও 'হনুমৎ শক্তি জাগরণ সমিতি' নির্মাণের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। সন্ত সমিতির নেতৃত্বে ও নির্দেশে অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দির পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্যে দেশ ব্যাপী হিন্দুদের সংগঠিত করতে হনুমৎ শক্তি জাগরণ সমিতির অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবকরা দেশের প্রতিটি শহর ছাড়াও দু'লক্ষ গ্রামে জনসচেতনতা কর্মসূচি রূপায়ণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১০-এর ২০ অক্টোবর অযোধ্যার করসেবকপুরমে সন্ত উচ্চাধিকার সমিতির সম্মেলন হয়। ওই বছরের ১১ ডিসেম্বর, দক্ষিণেশ্বরে জগজ্জননী ভবতারিণী মায়ের মন্দিরে এই কর্মসূচি অনুযায়ী কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ভোর হতে অগণিত কার্যকর্তা ও ভক্তদের সমাগমে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা দক্ষিণেশ্বর। গঙ্গাস্নান সেরে মন্দিরে পুজোও দেন সমবেত ভক্তবৃন্দ। সকাল ১০টা থেকে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও হনুমান চালিশা পাঠের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন, হিন্দু মঠ ও মিশনের সাধু-সন্তরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর আশ্রম, মহানাম অঙ্গনের প্রমুখ— শ্রীমৎ স্বামী বন্ধুগৌরব মহারাজ, রিষড়া প্রেম মন্দিরের পূজ্যপাদ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আর্যসমাজের প্রতিনিধিরাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তাঁরা ছাড়া এই সম্মেলনের বক্তা ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়া। শ্রীরামজন্মভূমিতে রামমন্দির পুনর্নির্মাণে হিন্দুসমাজ ভিক্ষা বা অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে না, স্বীয় লক্ষ্য অর্জনে শীর্ষ মহলে কোনো অনুরোধ-উপরোধ জানাবে না বলে এই সম্মেলনে সমস্ত বক্তারা এক বাক্যে ঘোষণা করেন।

২০২৩ সালে কর্ণাটকের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস দলের রাজনৈতিক ইস্তেহারে বজরঙ্গ দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণার প্রতিশ্রুতি এবং দুর্বৃত্ত-জেহাদি সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া (পিএফআই)-র সঙ্গে বজরঙ্গ দলকে একসারিতে রাখার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। আল-কায়েদা, ইসলামিক স্টেটের মতো ভয়ংকর জঙ্গি সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা পি এফ আইয়ের সঙ্গে শ্রীহনুমানভক্ত, দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী সংগঠন বজরঙ্গ দলের তুলনার প্রতিবাদে গত বছরের ৯ মে (মঙ্গলবার) কর্ণাটক ও ভারত জুড়ে 'হনুমৎ শক্তি জাগরণ'-এর ডাক দেয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। উত্তরপ্রদেশের দশ হাজার স্থানে সফল ভাবে পালিত হয় এই কর্মসূচি। অযোধ্যার হনুমানগঢ়ী-সহ বজরঙ্গবলীর মন্দিরগুলিতে সমবেত হয়ে মন্ত্র ও হনুমান চালিশা পাঠ, শ্রীহনুমানের ভজন, কীর্তন আয়োজন করে দেশব্যাপী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে অগণিত ভক্ত ও কার্যকর্তা। সর্বোপরি, গত ২২ জানুয়ারি শ্রীরামজন্মভূমি অযোধ্যায় নবনির্মিত রামমন্দিরে ভগবান রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা দেশজুড়ে বিগত কয়েক দশক ব্যাপী হনুমৎ শক্তি জাগরণের কার্যক্রমের অন্তিম ফলশ্রুতি। ভারতব্যাপী হনুমৎ শক্তির এই সার্বিক জাগরণেই সম্ভব হয়েছে ৫০০ বছর দীর্ঘ সংগ্রামের শেষে ধর্মের বিজয় প্রাপ্তি। অন্যায়-অধর্মের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে, পরাধীনতা বোধের গ্লানি মুছে ফেলে স্বাভিমান রক্ষায় ভক্তশ্রেষ্ঠ বীর চিরঞ্জীবীর হার না মানা লড়াইয়ের আদর্শই হোক ঐক্যবদ্ধ ভারতবাসীর ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বেঁচে থাকার, এগিয়ে চলার চিরন্তন পাথেয়।

মা-মাটি-মানুষের নেত্রীর স্বরূপ

অমিত কুমার চৌধুরী

যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। এর ব্যতিক্রম খুব কম রাজনীতিকই হতে পারেন। বিরোধী আসনে বসে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা যত সহজ, সরকারে গিয়ে কাজ করা তত সহজ নয়। বহুকাল সরকারে কোনো দল থাকলেও জনগণের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরণে সক্ষম হয় না। তাছাড়া জনগণের আশা, চাহিদা সীমাহীন, এছাড়া ক্ষমতায় থাকলে দুর্নীতি, অহংকার, স্বজনপোষণ ইত্যাদির জন্য সরকারের প্রতি মোহভঙ্গ হয়। আর সেই সময় বিরোধী দল জনগণের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে তীব্র আন্দোলনের মাধ্যম ক্ষমতাসীন দলের পতন ঘটিয়ে বিরোধীরা ক্ষমতায় আসে গণতন্ত্রে। এছাড়া দীর্ঘকাল কোনো দল ক্ষমতায় থাকলে জনগণের মধ্যে এই মানসিকতা কাজ করে যে নতুন দল এলে নতুন কিছু করে দেখাবে। নিজে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া। তৃণমূল দলটি কোনো আদর্শভিত্তিক দল নয়, ব্যক্তি কেন্দ্রিক দল, উদ্দেশ্য একটি নিজে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার বাসনা পূর্ণ করা। একমাত্র সিপিএম বিরোধিতায় তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল। ছিল না কোনো নীতি বা উচ্চ আদর্শ।

তিনি বিধান সভার নির্বাচনে দাঁড়াতেন না, সর্বদায় লোকসভায়। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ালো তার দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব। রাজ্যের কিছু নেতা ছিল যারা তরমুজ নেতা যেমন সোমেন, প্রিয় ও সুব্রত। বাইরে সবুজ ভেতরে লাল। বাইরে কংগ্রেস, ভেতরে সিপিএম। ওনারা তাদের কনিষ্ঠ মমতাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না। তাই পদে পদে অসহযোগিতা। অন্যদিকে দিল্লির রাজনীতির বিজেপির উত্থান ও কংগ্রেস দুর্বল হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিপিএমের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় সেখান

আন্দোলনের মধ্য দিয়েই নেতৃত্ব উঠে আসে। নেতা তৈরি করা যায় না। নেতা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে, নিজের নেতৃত্বের গুণে ও যোগ্যতায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো পিতৃপরিচয়ে কিংবা কার দাক্ষিণ্যে নেত্রী হননি। নিজের যোগ্যতায়, লাগাতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সিপিএমের মতো একটি সংগঠিত দলের বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই করে, নিজের কংগ্রেস দলের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অসহযোগিতায় নিজেকে নেত্রী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করেন, তা বলা বাহুল্য।

এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় ভীষণ কষ্ট করে তাকে লেখাপড়া শিখত হয়। তিনি নিজে একবার বলেছিলেন যে রাজনীতি তাঁর খুব ভালো লাগে। তাই রাজনীতির টানে তিনি ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। মহাবিদ্যালয়ে তিনি ছাত্র পরিষদের নেত্রী হন। পরবর্তীতে তিনি যুব কংগ্রেসেরও নেত্রী হন। তখন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস রাজনীতিতে সোমেন মিত্র, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, গণিখান চৌধুরী ও প্রণব মুখোপাধ্যায়ের নাম শোনা যেত, মমতার নাম কেউই জানতোই না। দক্ষিণ কলকাতা থেকে সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা ও নামি আইনজীবী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লোকসভা নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত ভাবে হারিয়ে জয়ী হয়ে প্রথম ভারতীয় সংসদে প্রবেশ করেন এবং রাজ্য রাজনীতিতে তাঁর এক বিশেষ পরিচিতি হয়। তিনি সুবক্তা কোনোদিনই ছিলেন না কিন্তু তার লড়াকু ভাবমূর্তি সাধারণ মানুষকে বিশেষত মহিলা ও যুবকদের ভীষণ আকৃষ্ট করলো। তার লক্ষ্য একটাই সিপিএম নামক জগদ্দল পাথরকে রাইটার্স থেকে টেনে নামানো ও থেকেও প্রত্যাশিত সমর্থন না পাওয়ায় তাঁর অবস্থা অনুকূল ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও লড়াই তিনি একাই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। নেতারা না থাকলেও দলের কর্মী ও জনগণের সমর্থন ছিল তাঁর সঙ্গে আর সেই শক্তিতে ভর করে তিনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নামক নতুন দল গঠন করলেন ১৯৯৭ সালে এবং ভীষণ ভাবে সফলও হলেন।

রাজীব গান্ধী তাকে খুব স্নেহ করতেন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও করে দেন। নরসিমা রাও মন্ত্রী সভাতেও তিনি স্থান পান। পরবর্তীতে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে তিনি বাজপেয়ী মন্ত্রীসভায় রেলমন্ত্রী হন ও পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রচুর রেলের উন্নয়ন করেন, তা দেখে অন্য রাজ্যের সাংসদরা বিরক্তি প্রকাশ করলেও তিনি নির্ভয়ে ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তা সংসদে রেল বাজেট পাশ করিয়ে নেন পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে, যা

ছিল অভূতপূর্ব। গণিখানের মতো লোকও মমতার প্রশংসা না করে পারেননি। অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ সিঙ্গুর আন্দোলন। যদিও এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি সাধন করেছে কিন্তু ধুরন্ধর বাস্তবাদী রাজনীতিবিদের মতো তিনি মানুষের, বিশেষত কৃষকদের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে বাজিমাত করলেন এবং ২০১১ সালের বিধান সভার নির্বাচনে ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের অবসান ঘটিয়ে নিজে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তাঁর স্বপ্ন পূরণ করলেন এবং এক অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন, প্রমাণ করলেন যে তিনি সত্যি তৃমমূল স্তরের নেতা, সার্থক করে তোলেন নিজের দলের নাম তৃণমূল কংগ্রেস।

কোনো এক দার্শনিক বলেছিলেন— 'A politician thinks for his next eleltion only but a statesman thinks for his next generation. দুর্ভাগ্য যে আমাদের দেশের রাজনীতিকরা প্রকৃত উন্নয়ন কীসে হবে তা না ভেবে সস্তা জনপ্রিয়তার দিকে ঝুঁকে শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য, ভোটে জেতার জন্য কেবল পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিতে বিশ্বাসী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন ভাবে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করেছেন যা রাজ্যকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে। একদিকে মুসলমান ও অন্যদিকে মহিলা ভোটব্যাংক। তাঁর জন্য তিনি যা করছেন তা রাজ্যের পক্ষে ভালো নয়। তিনি নিজেই প্রকাশ্যেই বলেছেন— 'যে গোরু দুধ দেয় তার লাথি খাওয়া ভালো। হাঁ, আমি মুসলমান তোষণের করি।' এই কথাগুলি ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী যা দেশের সম্প্রীতিকে ভীষণ ভাবে বিনষ্ট করবে। তাই দেখা যায়, দেগঙ্গাতে মুসলমানরা হিন্দুদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার দুঃসাহস দেখায়, হিন্দু ধর্মীয় শোভাযাত্রায় মুসলমানদের আক্রমণে প্রশাসন থাকে নীরব। মুসলমানরা আক্রমণাত্মক হয়ে গুলি চালালেও রাজ্য পুলিশ গুলি চালাতে পারে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কারণ দেখান গুলি চালালে অনেকের মৃত্যু হতো। তার মানে প্রশাসন ওদের হতেই। তিনি হিন্দুদের মন্দিরে তুচ্ছ

দিনের পর দিন রাস্তায় বসে সরকারি কর্মচারীরা তাদের প্রাপ্য ডিএ পাচ্ছেন না, অথচ মেলা, খেলা, ক্লাবের মোচ্ছবের নামে দেদার অনুদান বিলোনো হচ্ছে।

তাচ্ছিল্য করে পূজা দেন, ত্রিপুরার মন্দিরে পুরোহিত তাকে গোত্র জিজ্ঞাসা করলে বলেন, মা-মাটি-মানুষ।

অথচ হিন্দু হয়ে তিনি প্রতিবছর হিজাব পরে নামাজ পড়েন পুরুষদের সঙ্গে যা একেবারে অইসলামিক। কন্যাশ্রী করে টাকা দিচ্ছেন কিন্তু মেয়েরা চাকরি পাচ্ছে না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে মাসে ৫০০ টাকার ভিক্ষা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করেছেন। অথচ কোনো কর্মসংস্থান না করে কী সুন্দর ভোট বৈতরণী পার হয়ে যাচ্ছেন। টাটাকে রাজ্য থেকে তাড়ানোর ফলে কোনো শিল্পপতি এই রাজ্যে বিনিয়োগ করতে আসছে না, ফলে মমতার ১৩ বছরের শাসনকালে কোনো শিল্প গড়ে উঠেনি। কর্মসংস্থান নেই বললেই চলে। সরকারি নিয়োগ যা হয়েছে তা গোপনে ও চরম দুর্নীতির মধ্যে। কম লেখাপড়া জানা শ্রমিকরা ও উচ্চশিক্ষিত যুবকরা ভিন রাজ্যে কাজের সন্ধানে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় বা পশ্চিমবঙ্গের লজ্জা। এত দুর্নীতি হয়েছে যার জন্য ভারতে এই রাজ্যের মাথা হেট হয়ে যাচ্ছে। তাঁর বাকসংযম নেই বললেই চলে, অনবরত মিথ্যা, ভুল ও অর্ধসত্য অবলীলায় বলে চলেছেন। নাটকবাজিতেও তিনি খুবই পারদর্শী। ভোট এলেই তার পা ভাঙা, মাথায় আঘাত লাগা রাজ্যের মানুষের গা সওয়া হয়ে গেছে। 'বাংলা তার নিজের মেয়েকে চায়' বলে ক্ষমতার আসা অথচ তিনি নিজে মেয়ে হয়ে পার্কস্ট্রিট ধর্ষণ কাণ্ডে, নদীয়ায় ধর্ষণ ও পরে হত্যার পরেও সেই হতভাগ্য মেয়েদের জন্য তাঁর কোনো সহানুভূতি নেই।

বিরোধী নেত্রী থাকার সময় রাইটার্স বিল্ডিঙে নারী নির্যাতনের জন্য কী কাণ্ডটাই না তিনি করেছিলেন। মমতা কংগ্রেস ভেঙে দলটাকে পশ্চিমবঙ্গে শেষ করেছেন। বিজেপির সঙ্গে ঘর করেছেন। আদবানী, বাজপেয়ী তাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছিলেন, মন্ত্রী করেছিলেন। বাজপেয়ী মমতার মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিলেন কালীঘাটের বাড়িতে এসে। তবুও সেই বিজেপিকে নিজের সুবিধামতো তাদের সঙ্গ ত্যাগ করছেন সামান্য এক দুর্নীতির অভিযোগ উঠায় যা পরে বেঠিক প্রমাণিত হয়। তার তুলনায় পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগেও তিনি নির্বিকার, ভাবখানা এমন যেন কিছুই হয়নি। আবার যে সিপিএম তাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছিল তাদের সঙ্গে ফিশ ফ্রাই খেয়ে বিজেপিকে রোখার কাতর আবেদন জানান। বিজেপি এখন সাম্প্রদায়িক কিন্তু তখন নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। কী ভীষণ দ্বিচারিতা! সন্দেশখালিতে নির্যাতিতা মেয়েদের পাশে না দাঁড়িয়ে যার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের, সন্ত্রাসের অভিযোগে সেই কুখ্যাত শেখ শাজাহানের পক্ষে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে কথা বলেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এতো দুর্নীতি এরাজ্য দেখেনি। নেতাদের বাড়ি থেকে কোটি টাকা উদ্ধার হওয়া দেখে লজ্জায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মাথা হেঁট হয়ে যায়। বছরের পর বছর প্রকৃত চাকরি প্রাপকেরা ধরনায় বসলে তাদের প্রতি মমতার নেই কোনো সহনাভূতি। সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য ডিএ দিতে পারে না কিন্তু মেলা, খেলায়, ক্লাবে অপ্রয়োজনীয় খরচ করতে দ্বিধা নেই তাঁর।

কোনও রাজ্যে নির্বাচনের সময় একটি মানুষের মৃত্যু হয় না। এই রাজ্য শতাধিক নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়। সাম্প্রতিক সন্দেশখালিতে মা ধর্ষিতা, মাটি লুঠ এবং মানুষ খুন এই মমতার মা-মাটি-মানুষের সরকার। □

নীলবর্ণ শেয়াল

চণ্ডরব নামে এক শেয়াল বাস করত এক জঙ্গলে। এক রাতে সে বের হলো খাবারের খোঁজে। ঘুরতে ঘুরতে কখন যে সে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, তা খেয়াল করেনি। পড়ে গেল সে একদল কুকুরের সামনে। সব কুকুর তেড়ে এল ঘেউ ঘেউ

করে। শেয়াল দৌড়তে দৌড়তে ঢুকে পড়ল এক ধোপার বাড়িতে। সেখানে নীলগোলা জলে ভর্তি একটা গামলা ছিল। পড়বি তো পড়, শেয়াল ঝপাং করে পড়ল গিয়ে সেই গামলায়। কোনো রকমে যখন সে উপরে উঠল, তার গায়ের রং পালটে নীল হয়ে গেছে।

যে সব কুকুর তাড়া করেছিল, তারা ওই নীলবর্ণ শেয়ালকে দেখে ভাবল এ একটা ভয়ংকর কোনো জন্তু। তখন তারা সেখান থেকে চলে গেল। শেয়ালের আর কোনো ভয় নেই। সে বনের দিকে পা বাড়াল।

বনের মধ্যে একটা নীল রঙের জন্তুকে ঢুকতে দেখে বাঘ, সিংহ, হরিণ, মোষ, নেকড়ে সকলে ঘাবড়ে গেল। তারা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ফিসফিসিয়ে কেউ কেউ বলল—- এ আবার কেমন জানোয়ার! কোনোদিন একে দেখিনি, চিনিও না। কেমন জাতের কে জানে! এর ধারে-কাছে না থাকাই ভালো। তারা যে দিকে পারল, সরে পড়ল।

চণ্ডরব বুঝল, তাকে দেখে ওর সব ভয় পেয়েছে। এমনকী বড়ো জন্তুগুলোও পালিয়েছে। হ্যাঁ, এটাই মওকা। সে চিৎকার করে বলল— ওহে, তোমরা পালাচ্ছ কেন? তোমাদের ভয় কীসের? শোনো, কাছে এস ।

বনের জন্তুরা কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো। তারা আবার যে যার আস্তানা থেকে বেরিয়ে এল। চণ্ডরব তাদের উদ্দেশে বলল— ককুদদ্রুম আমার নাম। ভগবানের নির্দেশে আমি এই বনের রাজা হয়ে এসেছি। তোমরা আমার প্রজা।

তখন ছোটো-বড়ো সব জন্তুই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তারা করজোড়ে শেয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল— প্রভু, আমরা আপনার দাস। বলুন, আমরা আপনার জন্য কী করতে পারি?

চণ্ডরব হলো তাদের রাজা। সিংহ হলো তার মন্ত্রী। বাড়িঘর দেখাশোনার ভার পড়ল বাঘের উপর। চিতা, নেকড়ে ইত্যাদিকে নানা কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলো। কেবল দায়িত্ব পেল না তার জাতভাইয়েরা। চণ্ডরব তাদের সঙ্গে একটা কথাও বলল না। তাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। বনের শেয়ালরা কিন্তু চিনতে পারল ওই দুষ্টু শেয়ালকে। তারা মুখে টু শব্দটিও করল না।

শেয়াল চণ্ডরব পাত্র-মিত্রদের নিয়ে মহাসুখে রাজ্যপাট চালাতে লাগল। বাঘ-সিংহরা বনে ঘুরে ঘুরে শিকার ধরে আনে। চণ্ডরব রাজার নীতি মেনে আগে নিজে টপুরে খেয়ে বাকি সব অন্যদের দিয়ে দেয়।

মহাসুখে দিন কাটছে চণ্ডরবের। কিন্তু হঠাৎ ঘটে গেল এক বিপর্যয়। রাজা ককুদদ্রুম তার সভাসদদের নিয়ে বসে আছে। চারিদিকে চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ছিক এমন সময় বনের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে ভেসে এল এক আওয়াজ— হুক্কা হুয়া.....।

শেয়াল, কুকুর এইসব জন্তুর স্বভাব হলো তাদের জাতের কেউ যদি ডেকে ওঠে, তাহলে যে যেখানে থাকুক না কেন ডেকে উঠবে। নিজের জাতভাইদের গান শুনে রাজা চণ্ডরবের মনেও ফুর্তি জেগে উঠল। তার গায়ের লোম খাড়া হলো। চোখে জল গড়িয়ে পড়ল। সে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। আকাশের দিকে মুখ তুলে জাতভাইদের সুরে সুর মেলাল— হুক্কা হুয়া, হুয়া হুয়া......।

ব্যাস, আর যায় কোথায়। কারও বুঝতে বাকি রইল না, এ ব্যাটা একটা নগণ্য শেয়াল। তাদের সে ধোঁকা দিয়েছে। তারা সঙ্গে সঙ্গে ‘তবে রে ব্যাটা শেয়াল’ বলে চণ্ডরবের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে বোকা শেয়ালের দেহটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

পৃথ্বীরাজ সেন

নদ-নদী পরিচয়

উত্তরবঙ্গের নদ-নদী

গত কয়েকটি সংখ্যায় উল্লেখিত ছাড়াও এই নদীগুলি উত্তরবঙ্গের কোনো না কোনো জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে—রিতি, আলিকুড়ি, রামিয়াটং, জয়ন্তী, চিকিয়াঝোরা, ধাওরাঝোরা, সিকিয়িঝোরা, পুরানো রায়ডাক, বুড়ি তোর্যা, কালজানি, কার্তিকা, তুরতুরি, তিতি, হাউড়ি, কুলকুলি, ধোতিচু, বামনী, ঘরঘরিয়া, সানজাই, শানিয়াজান, খুটামারা, ঝালং, এলাইকুড়ি, জুলাই, কাহালাই। (সমাপ্ত)

এসো সংস্কৃত শিখি-১৯

তস্য (তার), কস্য (কার)। — পুং লিঙ্গ

তস্য নাম সঞ্জীব:। তার নাম সঞ্জীব।

কস্য নাম সঞ্জীব: ? কার না সঞ্জীব?

অভ্যাস করি—

তস্য নাম কিম্ ? – তস্য নাম সু খেন:।

তস্য নাম কিম্ ? – তস্য নাম বিলাস:।

তস্য নাম কিম্ ?– তস্য নাম রাহুল:।

তস্য নাম কিম্ ?– তস্য নাম সুকুমার:।

কস্য নাম সুখেন: ?

কস্য নাম বিলাস ?

প্রয়োগ –

তস্য দ্বারা দ্বিত্রাণি বাক্যাণি বদতু ।

সোমনাথ:, সঞ্জয়:, প্রাণেশ:, রঞ্জিত:, ধনঞ্জয়:, বিশ্বনাথ:।

ভালো কথা

রং খেলা

এবার আমরা দোলের দিল অন্য রকম করে রং খেলেছি। আমরা বারোজন বেরিয়েছিলাম। প্রথমে আমরা জমাদার ভাইদের কপালে আবির দিয়ে হাতে একটা চকোলেট দিলাম। ঘুরে ঘুরে ২৫জন জমাদার ভাইকে আবির দিয়েছি। ওরা কেউ কেউ সংকোচ করছিল। সবাই মিলে রং মাখাতে একটু পরেই স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছিল। তারপরে ফুটপাতে যারা থাকে তাদেরও রং মাখালাম। তারপর আমরা এক জায়গায় এসে নিজেদের খুব করে রং মাখালাম। শ্রেয়ার বোনের খুব রাগ হয়েছিল যে কেউ ওকে রং মাখায়নি। তারপর সবাই মিলে ওকে ভূত সাজিয়ে দিতেই খুব আনন্দ। বাড়িতে এসে ঠাকুমাকে এসব বলাতে ঠাকুমা বলল, খুব ভালো করেছিস, জমাদারদের তো কেউ রং মাখায় না।

অঙ্কিতা সরকার, ষষ্ঠ শ্রেণী, শিলচর, অসম।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ক না ল্প বি

(২) ণা ক ধি নি

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ফ উ শী চ্চ ল ন ল

(২) ম্ তী বা দ্বি এ য় ক মে

৮ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) পদ্মভূষণ (২) পদদলিত

৮ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) হিমালয়দুহিতা (২) সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্রেয়সী রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (২) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (৩) মায়া দাস, শেরপুর, হুগলী। (৪) বিবেক সরদার, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

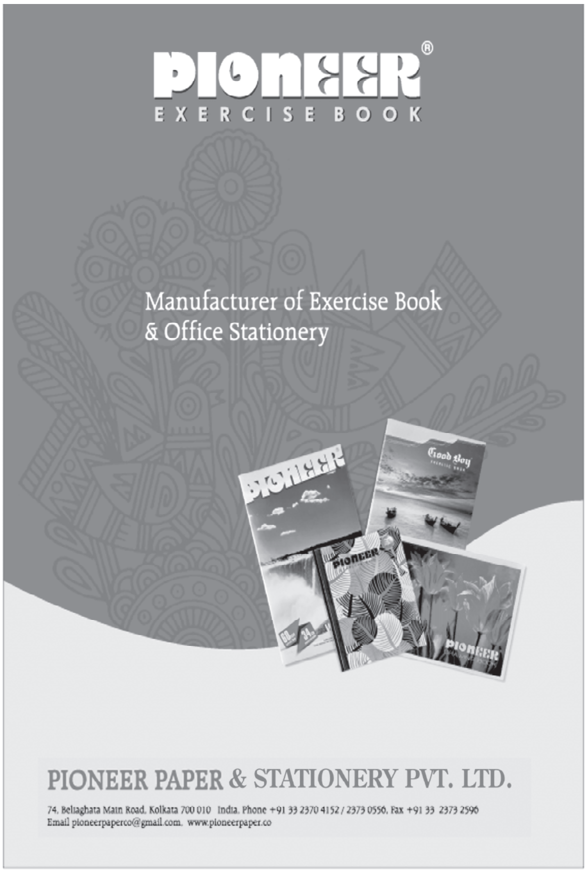

With Best Compliments from -

A
Well wisher

বর্তমান ভারত ও সাভারকর চর্চা

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনায়ক দামোদর সাভারকর। স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর। বর্তমান প্রজন্মের কাছে বোধ হয় এক বিস্মৃত চরিত্র। স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমগ্র ভারতবর্ষের বিদ্যালয়গুলি ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে সাভারকরের দু-তিন লাইনের বেশি জায়গা হয়নি। গান্ধী, জওহরলাল নেহরু থেকে এমএন রায়, মুজাফ্ফর আহমেদরা বরং কয়েক পাতা জুড়ে জাঁকিয়ে রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে

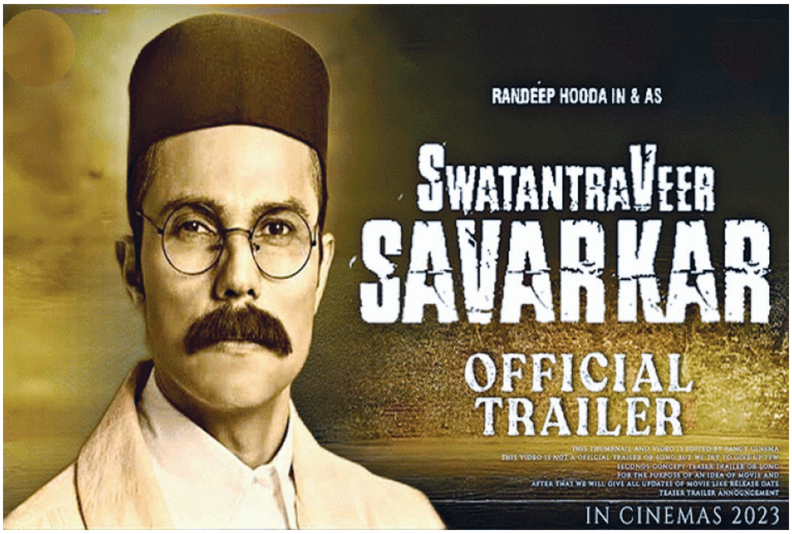

কমিউনিস্ট শাসনে ইতিহাসের পাঠ্যবইতে সাভারকরকে দেশদ্রোহী রূপেও চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে পরিস্থিতি পালটাচ্ছে। নতুন ভারতে আজ রাষ্ট্রবোধ জাগরিত। ভারতে হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণ ঘটেছে। এক্ষেত্রে সাভারকরের বলিদান, ত্যাগ, দেশাত্মবোধ অধিক মাত্রায় চর্চিত হওয়া দরকার। সাভারকর নিছক এক হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রচিন্তকই নন। ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত ইসলামীয় এবং পাশ্চাত্য প্রভাব মুক্ত এক সনাতন, সর্বশক্তিমান, আত্মনির্ভর ভারত গঠনের প্রেক্ষাপট রচয়িতা। ভারতে আজ যে সনাতনী জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে তার অন্যতম পথপ্রদর্শক বীর সাভারকর। তাই আজকের প্রজন্মের কাছে বীর সাভারকরের জীবনী চর্চা অন্যতম মহাকর্তব্য। তবে বর্তমানে এক্ষেত্রে সমাজ মাধ্যম ও চলচ্চিত্রের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

প্রখ্যাত হিন্দি চলচ্চিত্র অভিনেতা রণদীপ হুডা পরিচালিত 'স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর' চলচ্চিত্রটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও দর্শনীয়। পরিচালক ও অভিনেতা রণদীপ হুডা এক্ষেত্রে শুধু অভিনয়ের মাধ্যমে যে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন তা নয় বরং সঠিক ইতিহাসের তিনি পুনর্নির্মাণ করেছেন। ১৯১১ থেকে ১৯২১— আন্দামানে কারারুদ্ধ জীবনযাপন। পরিশেষে ১৯২৪-শে মুক্তি। চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে মুক্তিকালে তাঁর অগ্রজ ব্যতীত তাঁর পাশে কেউ নেই। সবদিক নিঃশব্দ, শূন্য। তিনি অভাজন। ইতিহাস তাঁর হাত ধরেও যেন ধরেনি। এটাই সাভারকরের সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি। ইতিহাস কাউকে পরিসর দেয় আবার কাউকে দেয় না। সাভারকরকেও দেয়নি। তিনি চর্চিত, নিন্দিত এবং ইতিহাসের এক অপ্রিয় সন্তানে পরিণত। সাভারকরের জীবন দর্শনকে উদারনীতিক মেধাজীবীরা কোনোদিনই গ্রহণ করতে পারেননি। তারা তার সম্পর্কে জনমানসে ভ্রান্ত ধারণা প্রোথিত করেছেন।

সেক্ষেত্রে সাভারকরের জীবন দর্শনের সঠিক মূল্যায়ন চলচ্চিত্রের মতো জনপ্রিয় মাধ্যমে জনমানসে তুলে ধরতে রণদীপ হুডার প্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয়। গান্ধী ও সাভারকরের যে বাকযুদ্ধ হুডা দেখিয়েছেন, তা অবশ্যই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত। আসলে আমাদের দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস এতকাল যেভাবে পড়ানো হয়েছে বা বোঝানো হয়েছে, আমরা সেটাই বুঝেছি বা মুখস্ত করেছি। পালটা প্রশ্ন করিনি বা করতে দেওয়া হয়নি। তবে যুগ পালটাচ্ছে। মানুষ জানতে, বুঝতে চাইছে। গান্ধীজীর ক্রোধ বর্জন আর অহিংসা নীতি উদারনীতিকদের কাছে পরম ধর্ম হয়ে উঠেছিল কিন্তু সাভারকর ক্রোধ বর্জন না করায় উপেক্ষিত হতে শুরু করেন। তবে সে ক্রোধ থেকে তার মধ্যে জন্ম নেয় কঠোর ইতিহাসবোধ। তবে সেদিন থেকেই তিনি মার্কসবাদী ইতিহাসবিদদের কলমে চিত্রিত ইতিহাসের পাতায় হয়ে ওঠেন কলঙ্কিত চরিত্র। এই সব বিতর্কিত প্রসঙ্গকেই সুন্দরভাবে চলচ্চিত্রে তুলে ধরেছেন রণদীপ হুডা।

সাভারকরকে নিয়ে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন। তাইতো পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান মাত্র সাতদিনের জন্য ভারতে এলেও সে সময়ে সাভারকরকে গ্রেপ্তার করে দীর্ঘ এক বছর কারাবাসে রাখা হয়। কী কারণে কারারুদ্ধ করা হয়, এর উত্তর নেহরু তথা কংগ্রেস নেতাদের কাছে ছিল না। মনে হয় সাভারকরের হিন্দুত্ব জাগরিত হলে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর গদি নড়বড়ে হয়ে যেত। যোগ্য অথচ পরাজিত, মেধাবী কিন্তু ব্রাত্য এই ধরনের মানুষের ক্রোধ ছাড়া কিই-বা থাকতে পারে। সাভারকরেরও তাই ছিল। তবে তার রাষ্ট্রবোধ ও হিন্দুত্ব দর্শনের মধ্যে কোনো খাদ ছিল না।

এবার সময় এসেছে পাখি পড়ানো ইতিহাস থেকে বেরিয়ে এসে সত্য অনুসন্ধানের। প্রশ্ন করবার। যুক্তি খোঁজার। এক্ষেত্রে চলচ্চিত্র অবশ্যই বড়ো মাধ্যম। বড়ো হাতিয়ার। ধন্যবাদ রণদীপ হুডা। সঠিক গবেষণার মাধ্যমে নতুন অজানা তথ্য এই চলচ্চিত্রে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বর্তমান সময়ে সাভারকর চর্চা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও জরুরি। হুডা সেই কাজটাই করেছেন। আমরা তো শুধু উদারনীতিকদের প্রশ্ন করব। নতুন ভাবে প্রকৃত গবেষণার দ্বারা সাভারকরকে জানবো। এটাই নবপ্রজন্মের কাছে আমাদের বার্তা। □

ফ ঃ ৬

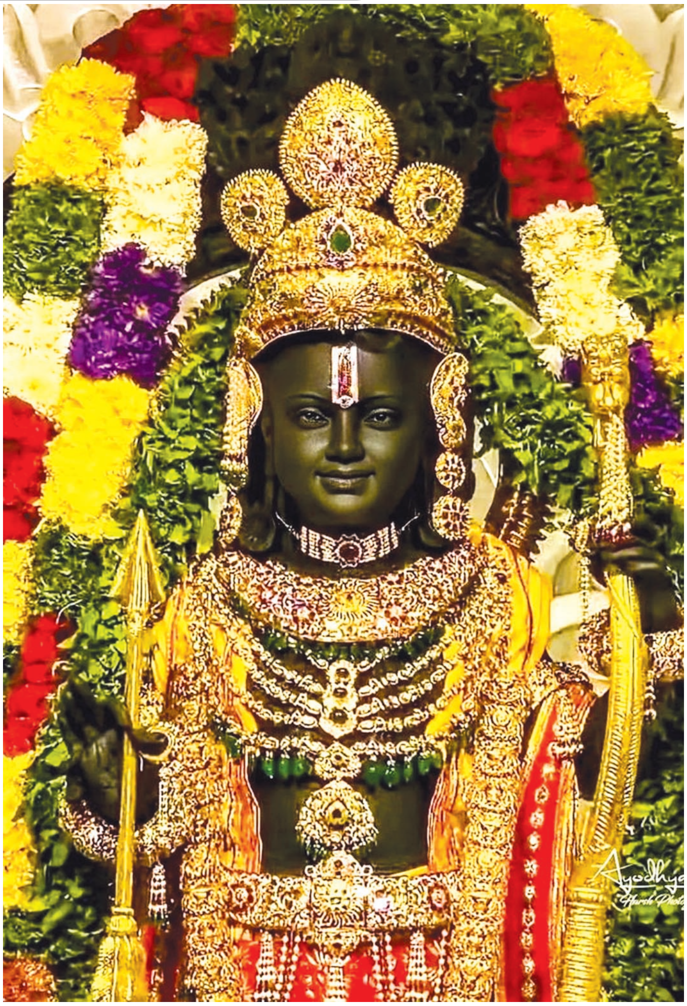

মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম এবং ভারতবাসীর সংকল্প

শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী

ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে আসমুদ্রহিমালচকে একই মন্ত্রে স্পন্দিত করেছেন 'শুদ্ধব্রহ্মপরাৎপর' প্রভু শ্রীরামচন্দ্র। সনাতন হিন্দুধর্মে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সাহিত্যে, সংগীতে, আধ্যাত্মিক চিন্তায়, মঠে-মন্দিরে, সমাজনীতি ও অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে প্রভু শ্রীরাম অপরিহার্য। ভারতীয় সভ্যতার শুরু থেকে বৈদিক পৌরাণিক যুগ পেরিয়ে আজ কলিযুগেও সমান প্রাসঙ্গিক মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম। ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে শ্রীরামই একমাত্র চরিত্র যাঁকে যুগে যুগে আদর্শ হিসেবে মেনে চলা যায়। ভারতীয় জীবনধারাও প্রভু শ্রীরামের জীবনাদর্শে রচিত প্রবাহ। রামায়ণ-মহাভারত কোনো গল্পকথা নয়, দুটি ভারতের জীবন্ত ইতিহাস। আসেতু হিমাচল ভারতবর্ষের স্থিতি, পরিধি, সভ্যতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ, বিজ্ঞানের প্রকাশ সবই আমাদের ঋষিদের দান যার প্রমাণ ইতিহাসের এই দুই মহাগ্রন্থ। সময় পরিস্থিতি সবই আমূল পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু ইতিহাস তো প্রাচীনতার ধারক হয়ে সত্যকে ধারণ করে রেখেছে। ভারতবর্ষ প্রায় এক হাজার বছর পরাধীন থাকার পরেও সেই সত্যকে পালটাতে পারেনি। কারণ এর ভিত্তিভূমি খুবই দৃঢ়।

ভারতবর্ষকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস সেই এক হাজার বছর থেকে আজও চলে আসছে। কখনও ধ্বংস করে, কখনও ভুল বুঝিয়ে, কখনও ধর্ম পরিবর্তন করিয়ে, আবার কখনও-বা পাঠ্যপুস্তকে বিকৃত ইতিহাস লিখে শিশুকাল থেকেই মগজধোলাই করানো হচ্ছে। ফলস্বরূপ মাতা-পিতা, পূর্বপুরুষ, বংশতালিকা, গোত্র, ঋষি ভুলে নেশাগ্রস্ত উলঙ্গ উদ্দাম নৃত্যে মূর্ছিত সমাজ বা যুবসমাজ নির্মাণ করে মানসিক পরাধীন করার কুচক্র ইদানীং কার্যকরী হয়ে উঠেছিল। রামচরিত্র না পড়ে বাম সংস্কৃতির নমুনা ছড়িয়ে পড়েছিল খুব দ্রুতভাবে। তাই পিতৃআজ্ঞা পালনকেই যিনি ধর্ম মনে করতেন সেই রামকে না জেনে বামকে জেনে বিপথগামী হয়েছিল একটি প্রজন্ম। বাড়ি থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পিতামাতাকে মেরে ধরে রাস্তায় বসিয়ে ভিক্ষা করিয়েছে। পশুবৃত্তির দ্বারা পাষণ্ড হয়ে পশুপ্রায় হয়ে উঠছিল। এমন সংস্কৃতির আমদানি করেছিল বামেরা।

তাই খুবই প্রয়োজন ছিল প্রভু শ্রীরামের জন্মভূমির পুনরুদ্ধার আর মন্দির স্থাপনের সংকল্প। প্রয়োজন ছিল দ্রুত নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করা, প্রয়োজন ছিল প্রভু শ্রীরামের ভব্য বিগ্রহ স্থাপন করে ইতিহাসের কাছে ক্ষমা চাওয়া। হিন্দুরা বিধর্মীদের সঙ্গে সেই দিনও লড়েছে, আজও লড়ছে। এই লড়াইয়ে আপামর সনাতনী কী সন্ত মহাত্মা, কী রাজপরিবার, কী নারীজাতি, কী বনবাসী, কী গিরিবাসী, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের মধ্যে সেই শুভক্ষণে মনে হয়েছে, আমরা পেরেছি। আমরা ইতিহাসের ঋণ শোধ করতে পেরেছি,উঠে দাঁড়িয়েছি। সিংহ গর্জনের নিনাদ ভারতভূমিতে ঘন ঘন আছড়ে পড়েছে। উদ্ধার হয়েছে প্রভু রামের জন্মভূমি। বনভূমি যেন পুষ্পলতায় সেজে উঠেছে। লোকান্তরে অবস্থিত আমাদের পূর্বজরাও যেন

আনন্দিত হয়ে পুষ্পবর্ষণ করছেন! আজ আমরা ধন্য হলাম, কৃতকৃত্য হলাম!

প্রভু শ্রীরাম আমাদের জন্য কী করেছেন? একটু রামচরিত্রে ফিরে দেখি। ঋষি বিশ্বামিত্র জেদ ধরলেন নাবালক দুই রাজকুমার রাম- লক্ষ্মণকে ঋষির আশ্রমে নিয়ে যাবেন, কারণ আকাশচারী মায়াবী রাক্ষসেরা তপস্যায় বিঘ্ন করে, যজ্ঞও নষ্ট করে, আবার সর্বত্যাগী আশ্রমবাসী মহাত্মাদের হত্যা করে। তাই ক্ষাত্রবীর্য রাজধর্ম হলো সজ্জনদের সুরক্ষা দেওয়া। রাজা দশরথ প্রাণপ্রিয় পুত্রদ্বয়কে ভয়ানক বিপদের মুখে ঠেলে দিতে রাজি হলেন না। কিন্তু ঋষিকে দেওয়া বাক্যরক্ষার্থে গুরু বশিষ্ঠের মধ্যস্থতায় রাম-লক্ষ্মণকে ঋষিকার্য সম্পাদনের জন্য আজ্ঞা দিলেন। ঋষি বিশ্বামিত্র পরের দিন প্রত্যুষকালে শ্রীরামকে দিব্যাস্ত্র প্রদান করলেন। পথে যেতে যেতে শ্রীরাম দেখলেন একটি অদ্ভুত সাদা রঙের পাহাড়। ঋষি জানালেন ওটি রাবণ-অনুচর মারীচ, খর, দূষণ প্রভৃতি রাক্ষসেরা আশ্রমবাসী নিরীহ তপস্বীদের হত্যা করে তাঁদের হাড় ফেলে ফেলে এই সাদা রঙের পাহাড় তৈরি করেছে। শ্রীরাম তৎক্ষণাৎ সংকল্প করলেন এই দুষ্কৃতীদের তিনি ধ্বংস করবেন। 'পরিত্রাণায় সাধূনাং'— তিনিই তো সংকল্প করেছেন। সারারাত জেগে যজ্ঞস্থল পাহারা দিলেন। ঋষির আশ্রমে সনাতন ধর্মের আচরণ, ঈশ্বর আরাধনা এবং তার মধ্যে দিয়ে বিশ্বকল্যাণের প্রার্থনায় যাতে কিছু বিঘ্ন না হয়, তাই ক্ষাত্রধর্ম পালন করে অস্ত্র ধারণ করে বিনিদ্র থেকে ঋষিদের রক্ষা করছেন সেই নাবালক বয়সেই। ভয়ংকর দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। রাক্ষস বধ হলো, অভিশপ্ত দিন শেষ হলো— ধর্মের স্থাপনা হলো।

এরপর শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের যাবতীয় মাঙ্গলিক কর্ম সমাধা হয়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে আমন্ত্রিত নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ উপস্থিত হয়েছেন। প্রজারা বাড়িতে উৎসব করছেন। ব্রাহ্মণেরা বিবিধ দেবতাদের আহ্বান করে তাঁদের অর্চনা করছেন। এমন সময় এক ভয়ানক রাত্রি সেই ক্ষণে উপস্থিত হলো। দেবী কৈকেয়ী পুরোনো শপথ মনে করিয়ে দিলেন রাজা দশরথকে— ভরতকে রাজ্য দিতে হবে আর রাম যাবে চোদ্দ বছর বনবাসে। মূর্চ্ছাগ্রস্ত পিতার পাশে দাঁড়িয়ে শ্রীরাম। বিমাতা তাঁকে রাজসিংহাসন ত্যাগ করে বনে পাঠাচ্ছেন, তখনও তিনি শান্ত। পিতাকে প্রদক্ষিণ করে চললেন ১৪ বছর বনবাসে বনবাসীর পোশাকে। তৎক্ষণাৎ তিনি পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করে আগামী কণ্টকাকীর্ণ সমস্ত পথ চললেন সমস্ত সুখ ত্যাগ করে। শ্রীরাম আবারও আচার আচরণের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে মহান হলেন সনাতন ধর্ম পালন করে। অনুজ ভরত দাদাকে রাজ সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করতে ফিরিয়ে নিতে এলেন, কিন্তু সংকল্পবদ্ধ হওয়ায় তিনি ভরতকে ফিরিয়ে দেলেন। প্রলোভন বারবার আসে যাতে আমাদের সংকল্প ভঙ্গ হয়, কিন্তু প্রভু শ্রীরাম বারবার ত্যাগব্রতে ব্রতী হয়ে ধর্মকে রক্ষা করলেন। সীতাহরণে একদিকে পত্নীবিরহে বিলাপ করছেন, আবার একদিকে সীতা উদ্ধারে তৎপর হচ্ছেন।

বনবাসী, গিরিবাসী, পশুপক্ষীদের নিয়ে সৈন্যবাহিনী নির্মাণ করলেন। নিজের শৌর্যের প্রতি কতটা নিষ্ঠাবান হয়ে আত্মসংযমের উচ্চ শিখরে উঠে, তাদের দ্বারাই সৈন্য নির্মাণ করলেন। স্বয়ং ভগবান হয়েও কোনো মায়াবী ঐশ্বর্য প্রকট না করে সেতুবন্ধন করে, পায়ে হেঁটে লঙ্কাপুরী ধ্বংস করলেন। ফিরিয়ে নিয়ে এলেন ভারতবর্ষের সম্মান। আবারও সনাতন ধর্ম রক্ষা করে আমাদের পথ দেখালেন। তাই যুগে যুগে ভগবান রূপে বা ভগবান বলে বিশ্বে পূজিত হন। তিনি সনাতন ধর্মকে নিজে রক্ষা করে মর্যাদা রক্ষা করেছেন। সর্বপ্রকারের মর্যাদায় তিনি ভূষিত। তাই তিনি মর্যাদাপুরুষোত্তম।

সনাতন ধর্ম মানেই রামরাজত্ব। ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে কীভাবে কীভাবে জন্মভূমি দখল করে ধ্বংস করা হয়েছে। ইতিহাস পালটে ফেলার প্রয়াস হয়েছে। লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ত থেকে সাধারণ মানুষ— প্রভু শ্রীরামের জন্মভূমির অপমানের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে নিজেরা বলিদান দিয়েছেন। তাঁদের নশ্বর শরীর ত্যাগ হয়েছে, কিন্তু তাঁদের বলিদান কলোত্তীর্ণ হয়েছে।

আজ ভারতবর্ষে এক শুভক্ষণে ৫০০ বছরের পর আমরা প্রভু শ্রীরামের জন্মভূমির অধিকার পেয়েছি। প্রতিষ্ঠা হয়েছে প্রভু শ্রীরামের শ্রীবিগ্রহ। আমরা এই বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছি। এখন সংকল্প রামারাজ্য স্থাপনের। শুধুমাত্র অস্ত্রের দ্বারা কিংবা রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখিয়ে এই রামরাজ্য স্থাপন সম্ভব নয়। শ্রীরামের আদর্শে গড়ে উঠতে হবে আমাদের দেশের ভাবী প্রজন্মকে। হৃদয়ে হৃদয়ে স্পন্দিত হবেন শ্রীরাম। শাসন-অনুশাসনের শৃঙ্খলে ব্যক্তিজীবন ও রাষ্ট্রজীবনকে এমন পবিত্র লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে হবে যাতে এই রাষ্ট্রমন্দির ও ভারতবর্ষ রক্ষা হয়। আমাদেরও নিষ্ঠার পরীক্ষা দিতে হবে। আমরা আবারও জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ হব এই সংকল্প নিয়ে প্রভু শ্রীরামের মতো সদা জাগ্রত থাকতে হবে। আমাদের লোভ পরিত্যাগ করে সৎচরিত্রে বলিষ্ঠ হতে হবে। সমগ্র 'ভারতবাসী আমার ভাই' এই মন্ত্রে জাতি ভেদের ছুঁতমার্গ থেকে উঠে সর্বজাতি বর্ণ এক হয়ে ধর্মরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। প্রভু শ্রীরাম আমাদের আশীর্বাদ করবেন— আমরা আমাদের সংকল্পে অটুট থেকে সিদ্ধিলাভ করবই।

জয় শ্রীরাম।

(লেখক রিষড়া প্রেমমন্দির আশ্রমের সম্পাদক)

এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কি আর ৪২ আসনে প্রার্থী নন?

বিশ্বপ্রিয় দাস

রাজ্যের শাসক দলের মধ্যে এখন ভবিষ্যৎ বক্তা অনেক। আছেন একজন সাংবাদিক কুলোশিরোমণি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে এক সময়ে ঘুরতেন সফরসঙ্গী সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসেবে। মেদিনীপুরের একটি ঘটনা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। বাম আমলে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন। একেবারে শেষ মুহূর্তে বিরোধী নেত্রী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী গেলেন মেদিনীপুরে। সঙ্গী এই সাংবাদিক, আরেক সঙ্গীও ছিলেন, দুই মশাই আগলে আগলে রাখতেন। পাছে নেত্রীর কাছে আর কেউ না পৌঁছতে পারে। তাঁরা সেই সময়ে বলতেন, তাঁদের নাকি সারা রাজ্যের একেবারে নীচুতলা থেকে উপরতলা মানুষের নাড়িনক্ষত্র সব নখদর্পণে। একটু কম দামি হোটেল খুঁজতেন অনামি সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকরা। আর বড়ো হাউসের সাংবাদিকরা থাকতেন ভালো হোটেলে। সঙ্গে থাকা ওই কুলশিরোমণিরা নেত্রীকে অনেক তথ্য দিতেন। নেত্রী অন্ধের মতো বিশ্বাস করে নিতেন সেইসব তথ্য। হেলায় ফেলে দিতেন রুট লেভেলে কাজ করা দলীয় সমর্থকদের দেওয়া তথ্য। সেই নির্বাচনে প্রবল হাওয়া বাম-বিরোধীদের। অন্তত তাঁরা তাই বলতেন সেই সময়। যারা একটু অনামি সাংবাদিক, ওই কুলশিরোমণিরা যদি একটু সুযোগ দিতেন, তাহলে তাঁরা সবাই মিলে খবর করতেন। তাও দূর থেকে। সেই নির্বাচনে মেদিনীপুর ছাড়ার আগের সন্ধ্যায় নেত্রী আঙুলে ভিক্টি সাইন দেখালেন এবং বললেন, আমরাই বিপুল সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসছি।

নির্বাচন হয়ে গেল। নেত্রীর দলের একেবারে ভরাডুবি হলো। সেই সময়ের একটি সূত্র বলেছিল, এইসব কুলোশিরোমণিদের ওপর ভরসা করলে ডুবতেই হবে। যেটা সেদিন ঘটেছিল। আজকের মতো পদলেনকারী সাংবাদিকের সংখ্যা সেই সময়ে কম ছিল। ফলে সেই সময়ের সঙ্গে আজকে হয়তো একটু হলেও পরিবর্তন ঘটেছে। পরবর্তীকালে সেই কুলশিরোমণি সাংবাদিক সাংসদ হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতার ফলস্বরূপ সমস্ত পদলেহনকারী সাংবাদিককে গুরুত্বপূর্ণ পদ দিয়েছিলেন তাঁর শাসনকালে। পরবর্তীকালে একটি কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে জেলে যাবার সময়ে মুখ্যমন্ত্রীকে যাচ্ছেতাই বলতেও দ্বিধা করেননি তিনি। আবার ফিরে তিনি এখন আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলাচ্ছেন। আর জ্যোতিষীর দায়িত্বও পালন করছেন। আগাম বলে দিচ্ছেন ভোটের ফলাফল। সমালোচনা করছেন বিরোধীদের। সেদিনের কথা মনে করিয়ে দিলাম একটি কারণে। এবারও আপনি ডুবতে চলেছেন অগাধ সলিলে। আপনার পাশে থাকা চিকিৎসক শিরোমণি, সাংবাদিক শিরোমণিই, দুজনেই মুখ্যমন্ত্রীকে ডোবানোর পক্ষে যথেষ্ট।

রাজ্যের শাসক দলের প্রচারে রাজ্যের উন্নতির জন্য কোনো গঠনমূলক কথা কী বলছেন? উত্তরে সবাই কী বলবেন? বলবেন, কত ভাতা, কত প্রকল্প। তিনি দিচ্ছেন। পরোক্ষে তিনি খামে ভরে ভোট কেনার জন্য সরকারি টাকা সারা বছর ধরে ছড়াচ্ছেন। এই বিষয়টা নির্বাচনী বিধিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পারের কৌশল বই তো নয়। আচ্ছা, উনি এখনতো আবার কল্পতরু হচ্ছেন। কখনও মেটাচ্ছেন কেন্দ্রের না দেওয়া একশো দিনের বকেয়া টাকা। বাকি টাকার কথা না হয় নাই-বা বলা গেল। এই প্রশ্ন করা যেতেই পারে, রাজ্যে পাঠানো কেন্দ্রের দেওয়া চালগুলির হিসেব কই? রাজ্যের দেওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের টাকার হিসেব কই? সর্বোপরি তিনি এই যে দানী হয়েছেন, সেই টাকার উৎস কী? তিনি কোথা থেকে পাচ্ছেন এই টাকা? তাঁকে তো কেন্দ্র একেবারেই টাকাপয়সা দেয় না। বঞ্চনা আর বঞ্চনা। ভোটের আগে গালমন্দ না করে তাঁর রাজ্যে খরচা করা টাকার উৎস নিয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে দিন। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আদালতে গিয়ে বঞ্চনা ও প্রাপ্য চেয়ে একটি মামলা করুন। সামান্য ডিএ আন্দোলনকারীদের থামানোর জন্য তিনি কোটি টাকা খরচা করে আইনজীবী রাখতে পেরেছেন, আর কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রাপ্য চেয়ে আদালতে যেতে পারছেন না। আসলে তিনি যে সব টাকা, সে আবাসন হোক বা একশো দিনের টাকা, ইতিমধ্যেই ভ্যানিশ করে দিয়েছেন। সেটা প্রকাশ্যে চলে আসবে যে!

উত্তরবঙ্গে টর্নেডো ভয়ংকর ভাবে আঘাত হানলো। মারা গেলেন আমাদের প্রিয়জনেরা। আহত হলেন অনেকে। ঘর-বাড়ি ভেঙে চুরমার। মুখ্যমন্ত্রী নাটক করতে চ্যাটার্ড বিমানে (ওনার ভাড়া করা) পৌঁছে গেলেন সেখানে। গিয়েই বললেন না, তোমরা আবাস যোজনার টাকা পেয়ে বাড়ি করনি কেন? আসলে তো ওই এলাকার বাসিন্দারা আবাস যোজনার কোনো টাকাই তো পাননি। সেকথা নানা বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমে সাধারণ, দুর্গত, আক্রান্ত মানুষেরা বলেছেন। তিনি গলা ফুলিয়ে বললেন, দেখছেন সবার আগে আমি এলাম। এই আসাটা কি দয়া করলেন? এতবড়ো একটা ঘটনা। সেখানে আপনি রাজ্যের প্রধান হয়ে ভরসা দিতে যাবেন, এতে দয়া দাক্ষিণ্যের মনোভাব নিয়ে কথা বলার কী আছে। যদি আপনি গিয়ে বলতেন, এটা আবাস যোজনার ঘর কেন হয়নি? সেটা মনে হয় ভালো শোনাত। আপনি চা সুন্দরী প্রকল্পের কথা বলেন। একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করে বলুন না, কতজন সেই সুবিধা পেয়েছেন।

আপনি কেন্দ্রের নানা প্রকল্প নিজের বলে চালান। সে যাক, কেউ কিছু মনে করেন না। কেননা সবাই জানেন কাজের বা প্রকল্পের টাকার উৎস কী? এখন কৃষক থেকে মজুর সবাই আপনাকে চিনে ফেলেছেন। শুধু আপনাকে নয়, আপনার দলের সবাইকে। কই আপনিতো আর বলতে সাহস পাচ্ছেন না যে ৪২ কেন্দ্রের প্রার্থী আপনিই। বললে যে আপনি দলেই কোণঠাসা হয়ে পড়বেন। আপনার প্রভাব কি আপনার কাছের নবীন প্রজন্ম মানবে? আপনি যতই দলকে আপনার-আপনার করুন।

আপনি এখন অকথা, কুকথায় বান ডাকছেন প্রতিটি নির্বাচনী ভাষণে। সিএএ নিয়ে জাতপাতের রাজনীতির আগুনে ঘি দিচ্ছেন। যেটা আপনি করে থাকেন। একসময়ে সংসদে আপনিই ভোটের বাজার গরম করতে, অনুপ্রবেশ ও অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে সুর চড়িয়েছিলেন। এমনকী সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রের দাবি, যা নিয়ে ২১ জুলাইয়ের আন্দোলন। আপনার উত্থান। আজ যখন সিএএ লাগু হয়েছে, সে তো আপনার সেই দাবি পূরণ। তাহলে আপনার আপত্তি থাকার কথা নয়। এখানে শুধুমাত্র তারাই নাগরিকত্ব পাবেন, যারা এখনও নানা কারণে নাগরিক হবার ক্ষেত্রে অসুবিধায় রয়েছেন। এখানে জাতপাতের রাজনীতির কোনও প্রশ্ন আসে না। এত বড়ো একটা সুযোগ পাচ্ছেন সবাই। আমাদের দেশে এই মুহূর্তে যারা রয়েছেন, তাঁরা কেউই আমাদের দেশ ছেড়ে কোথাও যেমন যাবেন না। আর তাঁদের নাগরিকত্ব সুদৃঢ় হবার এটা একটা পদক্ষেপ। কারোর নাগরিকত্ব যাবার নয়। মুখ্যমন্ত্রী হয়তো বিষয়টা জানেন না। নয়তো বা ইচ্ছা করে বিষয়টাকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করে চলেছেন। আর ভোটের ময়দানে রাজ্যের ভোলাভালা সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি কতে চাইছেন। এটা কী ঠিক করছেন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল?

এবার রাজ্যের শাসকদল ছলা-কলা-কৌশল অবলম্বন করতে চাইছে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ৪২ তা আসনের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী খুঁজে পাননি। ফলে ১১ জন বিধায়ক, দুজন অন্য রাজ্যের মানুষ, আর বাকিরা সবাইতো আছেন। তিনি বা তাঁর দল এটা কেন করলেন? দলের ভিতরে থাকা চাপা আগুনকে সামলাতে চাইলেন। আর চাইলেন একটা ঠেকা দিতে। যদি শাজাহান ধরা না পড়ত, তাহলে এই নির্বাচনে শাজাহানকেও প্রার্থী হিসেবে দেখলে অবাক হবার কিছু ছিল না, আদরের বালুও হয়তো প্রার্থী হতেন। বা কেষ্ট কন্যা। সে যাক, দলের ব্যাপার। তবে এবার কিন্তু আপনি আর ৪২টি আসনে একটাই মুখ নন। যদিও আপনার ভাইয়ের ছেলে (ভাইপো) মুখ হয়ে ওঠার চেষ্টা একটা করেছিলেন। চেষ্টাও যে তিনি করেননি, তা নয়। আপনাকে নানাভাবে ঘরে আটকে রেখে রাজ্যে নবজোয়ারে জল মাপতে বেরিয়েছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে এভাবে পিসিকে ছাপিয়ে যাওয়া যাবে না। তিনি সেই সময়ে পঞ্চায়েত ভোটের এক-একটা বুথ দখলের ব্লুপ্রিন্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এবার আর হয়তো হলো না। তাঁর সাঙ্গো পাঙ্গরা একটু বেকায়দায় পড়ে যাওয়াতে, তিনি রণে ভঙ্গ দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী, আপনার দল আপনাকে আর মানে না। আপনি হয়তো মনে মনে আপনার মানস গুরু জ্যোতিবাবুকে এই মুহূর্তে মনে করছেন। কেননা শেষজীবনে তাঁকেও পেতে হয়েছিল চরম অবহেলা। তিনি ঘনিষ্ঠজনেদের কাছে আক্ষেপে বলতেন সেই অবহেলার কথাও। আপনার অবস্থা যেন সেরকম না হয়। □

কেশবভবনে স্বস্তিকার নববর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৩ এপ্রিল, শনিবার, কলকাতায় অভেদানন্দ রোড স্থিত কেশব ভবনে হলো স্বস্তিকার (বাংলা জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক) নববর্ষ সংখ্যার (১৪৩১ বঙ্গাব্দ) প্রকাশ অনুষ্ঠান। এই সংখ্যার আলোচিত মূল বিষয় হলো— 'হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব'। এই বিষয়ে স্বস্তিকায় আলোকপাত করেছেন তথাগত রায়, ড. রাজলক্ষ্মী বসু, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, তিলক সেনগুপ্ত, প্রবীর ভট্টাচার্য, রবিরঞ্জন সেন প্রমুখ বিশিষ্ট লেখক। বিকেল ৫টা থেকে লেখক, পাঠক ও বিশিষ্ট অতিথিরা অনুষ্ঠানস্থলে সমবেত হতে থাকেন। বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভার শুরুতে 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা' উদ্বোধনী সংগীতটি সমবেত ভাবে গীত হয়। সমগ্র সভাটি পরিচালনা করেন স্বস্তিকার সহ-সম্পাদক সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল।

স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ সভার সভাপতি তথাগত রায়, সভার প্রধান বক্তা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সত্যনারায়ণ মজুমদার, স্বস্তিকার প্রকাশক ও মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল এবং স্বস্তিকার সম্পাদক ড. তিলক রঞ্জন বেরা সভামঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। এরপর তুলসী গাছে জলসিঞ্চন, তুলসীপূজন ও আরতি, প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্টরা। তুলসী মন্ত্র, দীপ প্রজ্বলন মন্ত্র ও সরস্বতী বন্দনার স্তোত্র পাঠ করেন দুজন সেবিকা ভগিনী। এরপর অতিথি বরণ পর্বে এই সভার সভাপতি কর্মজীবনে ইঞ্জিনিয়ার, বিশিষ্ট লেখক এবং ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের পূর্বতন রাজ্যপাল তথাগত রায় ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সত্যনারায়ণ মজুমদারকে পুষ্পস্তবক সহকারে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর স্বাগত ভাষণ দান করেন সারদা প্রসাদ পাল। তাঁর বক্তব্যে পূর্ববঙ্গে অধুনা বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে পৃথক দিনে নববর্ষ উদ্‌যাপনের বিষয়টি উঠে আসে। দেশভাগের আগে অখণ্ড বঙ্গে একই দিনে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হলেও ১৯৪৭ পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান এবং ১৯৭১-এর পরে বাংলাদেশে ১৪ এপ্রিল দিনটিকেই বঙ্গাব্দের প্রথম দিন হিসেবে পারতপক্ষে চাপিয়ে দেওয়া হয়। অন্যান্য বছর এপার ও ওপার বাঙ্গলায় পৃথক দিনে বর্ষবরণ উদ্‌যাপিত হলেও এই বছর লিপ ইয়ারের সৌজন্যে একই দিনে উদ্‌যাপিত হলো। একত্রে এই ব্যতিক্রমী নববর্ষ উদ্‌যাপন এই বছর সম্ভব হলেও অন্যান্য বছরে সেটি হবে না— বাঙ্গালির কৃষ্টি-সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে যা এক বড়ো মাপের বাধা বা বিচ্যুতি স্বরূপ বলে তিনি তুলে ধরেন।

তাঁর স্বাগত ভাষণের পর স্বস্তিকার নববর্ষ, ১৪৩১ সংখ্যা প্রকাশ করেন মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবর্গ। এই নববর্ষ সংখ্যার বিষয়, সেই বিষয়ের ওপর প্রকাশিত নিবন্ধসমূহ, নিবন্ধগুলির লেখকদের নাম, শিরোনাম, নিবন্ধের বিষয়সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করেন অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্যের পর স্বস্তিকার বিশিষ্ট লেখক ও 'পদ্মশ্রী' প্রাপক বিজ্ঞানী ড. নারায়ণ চক্রবর্তীকে শাল, উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক সহকারে সংবর্ধনা জানানো হয়। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. জিষ্ণু বসুর বক্তব্যে উঠে আসে 'আর্সেনিক টক্সিসিটি প্রিভেনশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট' বিষয়ে ড. চক্রবর্তীর দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক গবেষণা,

সংখ্যার (১৪৩১) প্রকাশ অনুষ্ঠান

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে তাঁর প্রকাশিত গবেষণাপত্র এবং আর্সেনিকমুক্ত করার মাধ্যমে তাঁর আবিষ্কৃত পানীয় জল শোধনের পদ্ধতির ইতিবৃত্ত। এরপর 'স্বস্তিকা লেখক সম্মান, ১৪৩১' প্রাপক বিশিষ্ট লেখিকা সুতপা বসাক ভড়ের নাম ঘোষিত হয়। মানপত্রটি পাঠ করেন অভিমন্যু গুহ। স্বস্তিকার অঙ্গনা বিভাগে ধারাবাহিকভাবে লিখে চলেছেন শ্রীমতী ভড়। তাঁর লেখায় উঠে এসেছে সমকালীন নারী সমাজের নানা বিষয়। তাঁর লেখনীতে সমৃদ্ধ হয়েছে স্বস্তিকা এবং স্বস্তিকার পাঠককুল। তাঁর রচিত নিবন্ধের মাধ্যমে বঙ্গীয় তথা ভারতীয় নারীসমাজের উদ্দেশ্যে সদর্থক বার্তা প্রেরিত হয়েছে। শাল, পুষ্পস্তবক, ফলের ডালি ও উত্তরীয় দিয়ে তাঁকে সম্মান জানানো হয়। স্বস্তিকা লেখক সম্মান প্রদানের জন্য স্বস্তিকাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুতপা দিদি।

এরপর 'শত বরষের দুয়ার প্রান্তে দুর্বার স্রোত-সিন্ধু, সূর্য সারথী সঙ্ঘ ডাকিছে জাগোরে সুপ্ত হিন্দু'— এই একক গানটি পরিবেশন করেন হাওড়া মহানগরের স্বয়ংসেবক শৌনক চক্রবর্তী। তারপর সভার প্রধান বক্তা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. সত্যনারায়ণ মজুমদার তাঁর ভাষণ উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল— 'হিন্দুত্বই ভারতের রাষ্ট্রীয়ত্ব'। তাঁর তথ্যনির্ভর বক্তব্যে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় রাষ্ট্রের প্রকৃত সংজ্ঞা। ভারতের রাষ্ট্রীয়ত্ব হিন্দুত্ব, এই দেশের হাজার হাজার বছরের রাষ্ট্রজীবনের দ্বারা প্রমাণিত এক শাশ্বত সত্য যে ভারত হিন্দুরাষ্ট্র। ভাষাগত ও রাজনৈতিক স্বার্থগত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ইওরোপীয় দেশগুলির নেশন-স্টেটের ধারণার বিপ্রতীপে ভারতবর্ষে শুভ বা ভদ্র ইচ্ছার দ্বারাই হাজার-হাজার বছর ব্যাপী সুদীর্ঘ সময়কাল ধরে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য হতে উদ্ভূত ভারতবাসীর পক্ষে মানসিক ঐক্যে পৌঁছনো সম্ভবপর হয়েছে যার মাধ্যমে রাষ্ট্রচেতনা তার পূর্ণ স্বরূপ পরিগ্রহ করেছে, যে সভ্যতা-সংস্কৃতিগত রাষ্ট্রবোধ তথা হিন্দুত্ব ভারত তথা হিন্দুরাষ্ট্রের মূল উপজীব্য।

তাঁর বক্তব্যের পর সভাপতির বক্তব্য উপস্থাপন করেন তথাগত রায়। দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, বাঙ্গালি জীবনে অস্তিত্ব সংকট, বামপন্থীদের ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারা, তাদের দীর্ঘ শাসনে রাজনীতিসর্বস্ব সমাজ গঠন এবং বাঙ্গালির মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়ার মতো বিপদ ও সমস্যার কথা তাঁর বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়।

বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড 'পশ্চিমবঙ্গ' সৃষ্টিতে ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক অবদানের কথা স্মরণ করে এই দেশবিরোধী অলাতচক্র থেকে অবিলম্বে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে ডাক দিয়ে তিনি এই অশুভ বামপন্থী শক্তি এবং দেশভাগের রক্তাক্ত ইতিহাস বিস্মরণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলকে সচেতন করেন। তাঁর বক্তব্যের পর হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি এবং সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট লেখক, পাঠক ও অন্য সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বস্তিকার সম্পাদক ড. তিলক রঞ্জন বেরা। শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করে সন্ধ্যে ৭টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ‘হেলথ্ ভিশন-২০৪৭’

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৪ এপ্রিল, ২০২৪ (১৪৩১ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ) উত্তর কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো ভারতের স্বাস্থ্যনীতি বিষয়ক একটি মহতী আলোচনা সভা— ‘হেলথ্ ভিশন-২০৪৭’। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩০০ জন চিকিৎসক ও মেডিক্যাল সায়েন্স (চিকিৎসা বিজ্ঞান)-এর ছাত্র-ছাত্রী এই কনক্লেভে অংশগ্রহণ করেন। ভারত সরকার দ্বারা গৃহীত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি এবং ২০৪৭-এর মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্যে পৌঁছতে এই নীতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ্ হেলথ্ সায়েন্সেসের পূর্বতন উপাচার্য ডাঃ রাজেন্দ্র পাণ্ডে, পূর্বতন স্বাস্থ্য (শিক্ষা) অধিকর্তা ডাঃ প্রদীপ মিত্র,পূর্বতন স্বাস্থ্য (শিক্ষা) অধিকর্তা ডাঃ সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের পূর্বতন অধিকর্তা ডাঃ শ্যামল চক্রবর্তী, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ্ হোমিওপ্যাথির অধিকর্তা ডাঃ সুভাষ সিংহ এবং সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহ-অধিকর্তা ডাঃ তুষার মণ্ডল। সিনিয়র ডাক্তারবাবুরা এই কনক্লেভে ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যনীতি বিষয়ে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ড. সিভি আনন্দ বোস প্রেরিত শুভেচ্ছা বার্তা সম্প্রচার করে সম্মেলনের সূচনা হয়। সভার প্রধান অতিথি ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের পূর্বতন রাজ্যপাল অধ্যাপক তথাগত রায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। স্বামীজীর পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সেক্রেটারি স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী মহারাজ ‘বিকশিত ভারত’ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নের বিষয়ে আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ চিন্তাধারা তুলে ধরেন। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের এথিক্স অ্যান্ড মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন বোর্ডের সদস্য ডাঃ যোগেন্দ্র মালিক নবরূপে গঠিত কমিশনের তরফে স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রণীত পরিবর্তনসমূহ তুলে ধরা ছাড়াও কোভিড মহামারীকালীন স্বাস্থ্য বিষয় সম্পর্কিত একাধিক বিষয়, ন্যাশনাল হেলথ্ মিশন, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প, স্বাস্থ্যবীমার প্রয়োজনীয়তা, মা ও নবজাতক শিশুর স্বাস্থ্যগত পরিবর্তন, প্রকৃতিগত স্বাস্থ্য (এনভায়নমেন্টাল হেলথ্), প্রাচীন ভারতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও ভারতীয় পরম্পরাগত চিকিৎসা প্রণালীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গবেষক ড. জিষ্ণু বসু নাগরিক কর্তব্যের উল্লেখ করে সাধারণ নির্বাচনে ভোটদানের মাধ্যমে সঠিক জাতীয় নেতৃত্ব চয়নের বিষয়টি উপস্থাপন করেন, যে নেতৃত্ব জাতীয় স্বার্থে এবং ‘সবার জন্য উন্নততর স্বাস্থ্য’-এর লক্ষ্যে ব্রতী হবে। আলোচনাসভায় ভারতে কোভিড মহামারী মোকাবিলায় দৃঢ় পদক্ষেপ ও প্রয়াসের জন্য ভারত সরকারের কৃতিত্ব স্বীকার করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করা হয়। উন্নততর স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সৃষ্টি এবং স্বল্প সময়ে সকল ভারতবাসীর জন্য সুষ্ঠু, নির্ঝঞ্ঝাট করোনা টিকার ব্যবস্থা করে অনেক উন্নত দেশ অপেক্ষা ভারত অসাধারণ স্বাস্থ্য পরিষেবা দান করেছে বলেও এই সভায় সবাই মতপ্রকাশ করেন। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন গঠন, আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রকল্প ভারতের স্বাস্থ্যনীতিতে এক ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে যা ভারতীয় সমাজে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সৃষ্টিতে সহায়ক বলে ডাক্তারবাবুরা তাঁদের মত দেন। বর্তমানে গৃহীত ব্যবস্থা, প্রণীত প্রকল্প ও প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহ ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতীয় স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আন্তর্জাতিক মানের করে তুলবে বলেও আশাপ্রকাশ করেন বক্তারা। ডাঃ প্রদীপ মিত্র গোটা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী মানুষদের জন্যেও আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধাদানের বিষয়টি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা দেশ জুড়ে ২৩টি এইমস্ হাসপাতাল নির্মাণ ছাড়াও ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগের ওষুধ, কার্ডিয়াক স্টেন্টের মূল্য হ্রাস করার জন্য ভারত সরকারকে সাধুবাদ জানান। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে আয়ুষ চিকিৎসার প্রসার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডাঃ সুভাষ সিংহ। বহু কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পের সুবিধালাভে পশ্চিমবঙ্গবাসী বঞ্চিত বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন ডাঃ শ্যামল চক্রবর্তী। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীন বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে প্রসূতি মা ও নবজাতকের মৃত্যুহার কমেছে বলে জানান ডাঃ অনুজা বিনায়কিয়া। সভা শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এই কনক্লেভের আয়োজক সমিতির সভাপতি ডাঃ অরূপ কুমার দাশ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা